পাদ্মিনী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
প্রণীত

~~7049~~
6249

উপহার-পৃষ্ঠা

পদ্মিনী

ঐতিহাসিক চিত্র গ্রন্থাবলী

প্রথম সংস্করণ

মূল্য ১৷৷০

৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা মেট্‌কাফ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উৎসর্গ

হে

মহাপ্রস্থানের যাত্রিক,

তোমারই

স্মৃতি বহন করিবার জন্য

পদ্মিনী

গৃহে গৃহে বিরাজ

করুক।

ঐতিহাসিকচিত্র গ্রন্থাবলী

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
প্রকাশক

পদ্মিনী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
প্রণীত

PRINTED BY
R. J. SEXTON & BRO.

গ্রন্থকারের নিবেদন

জীবনের দুইটী উৎকট মুহূর্ত্তে আমার দুইটী গ্রন্থ রচিত। "সাবিত্রী-সত্যবান্" প্রকাশ-কালে যে অভাবনীয় বিপদ্-জাল প্রবল সাগর-বন্যার মত আমাকে একেবারেই গ্রাস করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল, "পদ্মিনী"-প্রকাশের কালেও সেই বন্যা আসিয়া, আমার যাহা কিছু ছিল সকলই প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে! উচ্ছ্বসিত বারিরাশির মধ্যে এখনও আমার গৃহচূড়াটী সম্যক্ ভাসিয়া উঠে নাই—কখনও উঠিবে কিনা কে জানে? প্লাবন কখনও চিরকাল থাকে না—থাকিবেও না। কিন্তু যাহার উপর দিয়া ইহার আক্রমণ বহিয়া যায়, তাহা সব সময়ে ফিরিয়া পাওয়া যায় না!

কাজেই, বিশেষ ইচ্ছা-সত্ত্বেও "পদ্মিনী"র জন্য যতটুকু চেষ্টা করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা আমি করিতে পারি নাই। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হয়। এই যে "সাবিত্রী-সত্যবান্" ও "পদ্মিনী"র জন্ম-ব্যাপারটার

মধ্যে একটা ভীষণ সাদৃশ্য রহিয়াছে, এ সাদৃশ্যের মূল কোথায়? শুধু কি প্রকৃতির একটা অন্ধ খেয়ালই ইহার ভিত্তি, না অপর কোনও রহস্য ইহার ভিতরে নিবদ্ধ আছে?

যে সাদৃশ্য এত প্রবল, এত কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ, তাহাকে ওই খেয়ালের উপরে স্থাপিত করিতে কোন বিবেচক ব্যক্তিই সম্মত হইবেন না। আমারও সেরূপ বিশ্বাস নহে। যদি ইহার মূলে জগদীশ্বরের অন্য কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য বা রহস্য থাকিয়া থাকে, তবে হে জগদীশ্বর! তোমার সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হউক! আমায় শুধু উাহার মূল্য বহন করিবার ক্ষমতা দিও, তবেই আমি স্বার্থক হইব, আমার "পদ্মিনীও' ধন্য হইবে!

পদ্মিনী

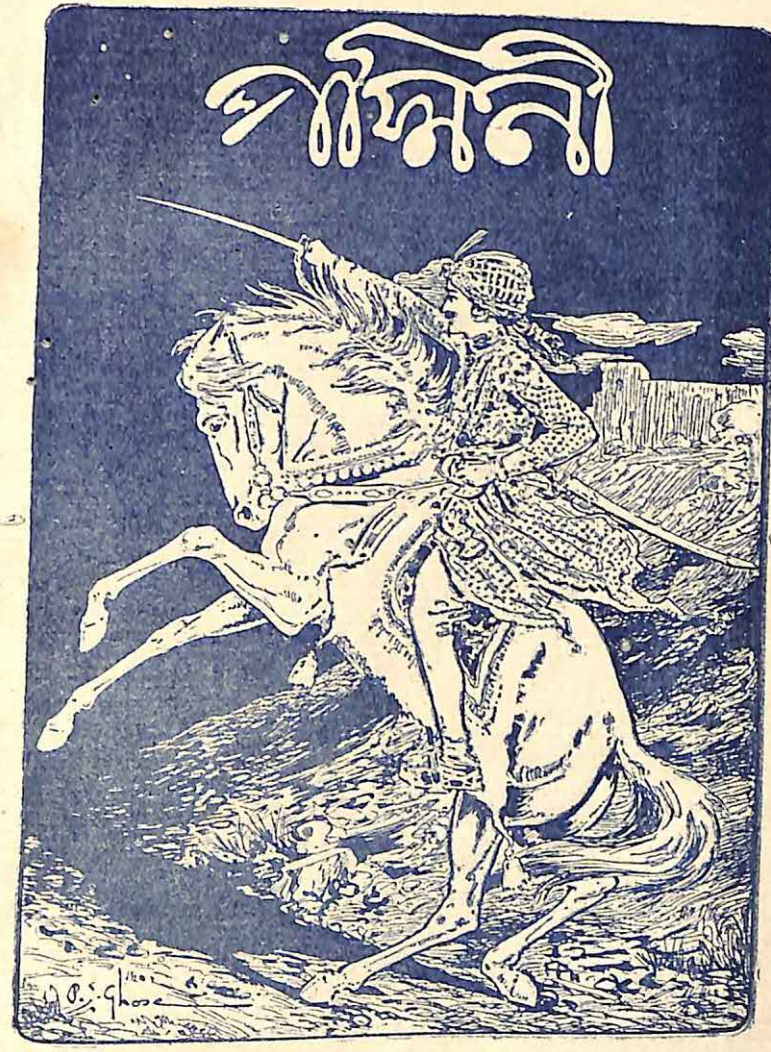

উপক্রমণিকা

সে আজ বহুদিনের কথা, যখন মুসলমানগণ প্রথম আমাদের দেশে রাজ্যস্থাপন করেন। সে সময় হইতে ক্রমে সাত শ'টী বৎসর কালের ক্রোড়ে গড়াইয়া গিয়াছে! এই সময়ের মধ্যে কত অপূর্ব্ব-অপূর্ব্ব ঘটনা, লোমহর্ষণ-ব্যাপার এ দেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। পদ্মিনী-কাহিনী তাহাদেরই অন্যতম।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই ভারতে যথার্থ মুসলমান-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গোটা কয়েক মুসলমান ভূপতি বা সেনাপতি ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার ভারতাক্রমণ করিলেও, ভারতে রাজ্যস্থাপনের কল্পনা তাঁহাদের মাথায় বড় একটা আসে নাই। লুণ্ঠনই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ঘোরদেশের সুলতান সিহাবুদ্দীন মহম্মদ্ প্রথমে সে কল্পনাকে মস্তিষ্কে স্থান দেন। তাহার ফলে তিরৌরীর যুদ্ধের পরে দিল্লীতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। দেশময় একটা কোলাহল পড়িয়া যায়!

তখন ভারতে যে সকল হিন্দুরাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল—কনৌজ, গুজরাট, চিতোর ও দেবগিরি। তিরৌরীর যুদ্ধে মহম্মদঘোরীকে বাধাপ্রদান করিবার জন্য চিতোরাধিপতি সমরসিংহও দিল্লীশ্বরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, প্রাণ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি চিতোর হইতে বঞ্চিত হন নাই। তিরৌরীর যুদ্ধে হিন্দুদের পতন হইলেও চিতোর তেমনই স্বাধীন ছিল, তেমনই গৌরবের সহিত মস্তক উন্নত করিয়া ছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে গৌরবোন্নত মস্তক নত হয় নাই। কিন্তু

মাঝে-মাঝে তাহার সুন্দর আকাশের উপর দিয়া কাল কাল মেঘ বহিয়া যাইত।

মহম্মদঘোরী দিল্লীতে রাজ্যস্থাপন করিয়া স্বয়ং তথায় রাজত্ব করেন নাই। সে কার্য্যের জন্য দিল্লীতে তিনি তাঁহার একজন অনুচরকে রাখিয়া যান। সেই অনুচর ও তাঁহার পরবর্ত্তী কয়েকজন ভূপতি ইতিহাসে 'দাসরাজগণ' বলিয়া পরিচিত।

এই 'দাসরাজগণের' পরে 'খিলিজিগণের' অভ্যুদয়। খিলিজিরা 'দাসরাজগণে'র অধীনেই দিল্লীতে রাজকার্য্য করিতেন। এই বংশের প্রথম রাজা জেলালুদ্দীন খিলিজি।

জেলালুদ্দীনের এক অতি প্রিয় অনুচর ছিল। তাঁহার নাম ছিল আলাউদ্দীন। জেলালুদ্দীন আপন কন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে রাজ্যের প্রধান সেনাপতি করেন এবং পুত্রাধিক যত্নে পালন করেন।

বীরত্বে ও সাহসে আলাউদ্দীন সম্পূর্ণই এই সম্মানের উপযুক্ত ছিলেন; কিন্তু কৃতজ্ঞতা বলিয়া একটা জিনিস তাঁহার হৃদয়ে আদৌ ছিল না। এমন যে সদাশয় প্রভু, যাঁহার আশীর্ব্বাদে তাঁহার এতটা প্রতিপত্তি, এতটা সমৃদ্ধি হইয়াছিল, যাঁহার স্নেহের ধার শোধ করা তাঁহার পক্ষে

মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না, তাঁহাকে তিনি তাঁহারই প্রদত্ত অস্ত্রে বিনষ্ট করিলেন। যে ক্ষমতা এবং সম্মানে এত দিন জেলালুদ্দীন তাঁহাকে পুষ্ট করিয়াছিলেন, আলাউদ্দীন সেই ক্ষমতা এবং সম্মানকেই তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপ প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। রাজ্যলোভে আলাউদ্দীন জেলালুদ্দীনকে হত করিলেন।

আলাউদ্দীনের রাজ্যবিস্তারের বাসনা বড়ই প্রবল ছিল। জেলালুদ্দীনের জীবিতাবস্থায়ই তিনি দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি রাজ্য লুণ্ঠন করেন। সিংহাসনে বসিয়াই তিনি গুর্জ্জরের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। অল্পদিন পূর্ব্বে চিতোরের হস্তে গুর্জ্জরের বড়ই নিগ্রহ হয়। সেই সংঘর্ষে অপরিমিত শক্তিক্ষয় হেতু গুর্জ্জর এই আঘাত সহ্য করিতে পারিল না—তাহার পতন হইল। দেশে আবার একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

তার পরই চিতোরের সঙ্গে আলাউদ্দীনের সংঘর্ষ। সে সংঘর্ষের জয়-পরাজয় অনির্দ্ধারিত। চিতোর ধ্বংস করিয়াও আলাউদ্দীন সেবার প্রাণে-প্রাণে যে পরাজয় অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার অনুরূপ ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! সে সংঘর্ষে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াও চিতোর

সেবার যেরূপ জয়মাল্য গলায় পরিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অলৌকিক !

সেই অলৌকিক কাহিনীরই যৎসামান্য পরিচয় এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। চিতোর ও আলাউদ্দীনের সংঘর্ষে জেতা কে, বা বিজেতা কে, সে সমস্যার বিচার সহজসাধ্য কিনা, এই আখ্যায়িকা পাঠেই পাঠক-পাঠিকা তাহা আনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। আমরা গুর্জ্জর জয়ের পর হইতে এই আখ্যায়িকা বলিতে আরম্ভ করিব।

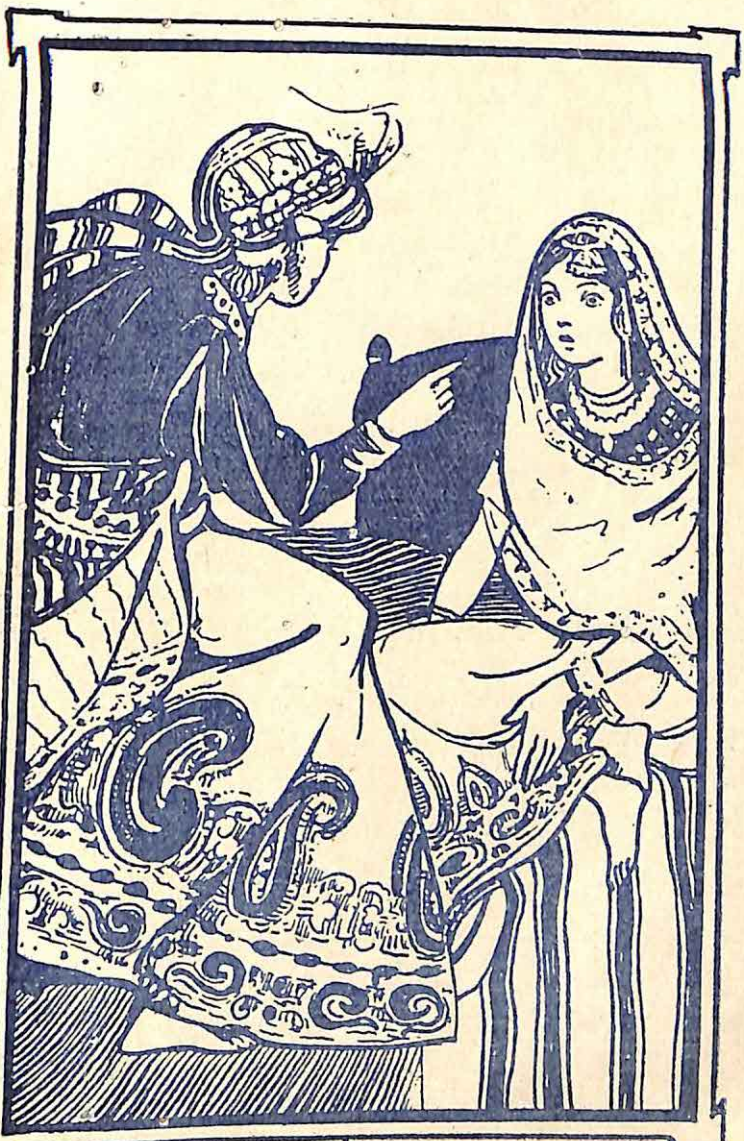

HOOGHLY SCHOOL

পদ্মিনী

প্রথম খণ্ড

মেঘ-সঞ্চার

(১)

পাঁচশত ফিট উঁচু পাহাড়ের উপরে সেই চিতোর দুর্গ!
—আজও সেই বিরাট্ দুর্গের ভগ্নাবশেষ বহুদূর জুড়িয়া

একটা বিকট শ্মশানের মত পড়িয়া আছে। গোটাকতক পার্ব্বত্য নির্ঝর এবং আরাবল্লী পর্ব্বতের মুক্ত বায়ুস্রোত শুধু সেই নির্জ্জন দেশ ধ্বনিত করিয়া "হায় হায়" করিতেছে—মানুষ কিম্বা প্রাণী বড় একটা তথায় দেখা যায় না।

এইখানেই একদিন বাপ্পারাও, খোমান, সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের রাজধানী ছিল; এইখানেই একদিন জয়মল্ল, পুত্ত, হামীর ও প্রতাপসিংহ মাতৃভূমির জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন; এই চিতোরের দ্বারেই একদিন সমগ্র হিন্দুসাম্রাজ্যের মস্তক নত হইয়া পড়িত! এখন সে সকল কোথায়? নাই—কিছুই নাই!

কিন্তু এখনও চিতোর দর্শন করিলে হিন্দুর ধমনী স্পন্দিত হইয়া উঠে, হৃদয়ে কি এক করুণ সঙ্গীত ধ্বনিত হয়, এখনও এই ভগ্ন-গৃহ-প্রাচীরগুলির দিকে চাহিলে অতীতের কত কথা মনে পড়িয়া যায়!

কিঞ্চিদধিক ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে এই চিতোর দুর্গে হঠাৎ একদিন একটী অশ্বারোহী অতিথির আগমন হইয়াছিল।

তখন চিতোরের সমৃদ্ধির কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য গুর্জ্জরদেশের সহিত বিরোধ উপস্থিত, চিতোর তখন সবে মাত্র সে দেশ জয় করিয়াছে—

চারিদিকে "জয়-জয়কার" পড়িয়া গিয়াছে! চিতোরের গৃহে গৃহে তখন আমোদ-উৎসব চলিতেছে!

অশ্বারোহী আসিয়া দুর্গের ছয়টা ফটক অতিক্রম করিয়া ক্রমে সপ্তম ফটক 'রামপোল' দরজার নিকটে দাঁড়াইল। তখন প্রহরী আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

অশ্বারোহী কোন উত্তর করিল না; কেবল মাত্র একটী স্বর্ণাঙ্গুরী দেখাইল, আর তার সঙ্গে একখানি পত্র। পত্রখানিতে রাণার নাম লেখা!

প্রহরী সসম্ভ্রমে দরজা খুলিয়া দিল। অশ্বারোহী প্রাসাদের দিকে চলিয়া গেল।

সেদিন আহারান্তে চিতোরেশ্বর যখন আপনার বিশ্রাম-কক্ষে বসিয়া নির্ম্মল আকাশের স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতেছিলেন, ও দূরে দুর্গশিখরের রক্তপতাকাটীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি এক সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তখন দ্বারের প্রহরী আসিয়া অভিবাদন জানাইয়া রাণাকে দূতের আগমন সংবাদ দিল এবং একখানি সুন্দর মোহর করা লিপি সম্মুখের রৌপ্যাধারের উপর রাখিয়া দিল। চিতোরে গুর্জ্জর-জয়ের নিমিত্ত যে একটী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইবে, তাহারই একটী নক্সা দেয়ালে ঝুলিতেছিল; রাণা তখন দৃষ্টি ফিরাইয়া

সেইদিকে দেখিতেছিলেন। সেদিক্ হইতে চক্ষু তুলিয়া পত্রখানির দিকে চাহিলেন। চাহিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। এ কার চিঠি? এ যে গুর্জ্জররাজের মোহর! তাঁহারই চিরশত্রু গুর্জ্জররাজের!

রাণা তাড়াতাড়ি মোহর ভাঙ্গিয়া পত্র পাঠ করিতে গেলেন! সত্যই নীচে মোটা মোটা অক্ষরে গুর্জ্জরেশ্বর করণ-রায়ের নাম লিখিত রহিয়াছে!

রাণা পড়িলেন,—

"মহারাণা, শুনিলাম, আমাকে জয় করিয়া আপনি খুব উল্লাসে মাতিয়াছেন, গুর্জ্জরজয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু ততোধিক লাঞ্ছনা যে আপনার গৃহে আছে—সে কথা ভাবিয়াছেন কি? অচিরে তাহার পরিচয় পাইবেন! গুর্জ্জরজয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের পূর্ব্বেই অপর এক ব্যক্তি চিতোর-জয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে! হায়, তখন আপনার এ উৎসব কোথায় রহিবে!

আলাউদ্দীন গুর্জ্জর জয় করিয়াছে—শীঘ্রই অন্যান্য হিন্দু-রাজ্যও জয় করিবে। চিতোরও তাহাতে বাদ পড়িবে না। নিশ্চিন্ত হইয়া আপনি প্রতিবেশীর সমাধির উপরে

নৃত্য করিতেছেন, করুন; ভাইকে নির্য্যাতন করিয়াছেন বলিয়া উৎসব করিতেছেন, করুন। কিন্তু এ আমোদ নিতান্তই দুই দিনের!

গুর্জ্জর যে এত সহজে আলাউদ্দীনের হাতে ধরা দিয়াছে, সে কেন জানেন? আপনাদেরই অনুগ্রহে!—আপনি যদি এমনি করিয়া গুর্জ্জরের হাড় নিষ্পেষিত না করিতেন, তবে মুসলমানের পক্ষে গুর্জ্জর জয় করা এত সহজ হইত না। আপনাদের এই স্পর্দ্ধায় চিতোরও অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এ কথায় সন্দিহান হইবে না। আমি মনে প্রাণে আপনাদের এই অভিসম্পাত দিতেছি—এ অভিসম্পাত ফলিবে!

মনে করিবেন না, রাজ্য হারাইয়াই আমি এতটা বিচলিত হইয়াছি। রাজ্য চিরকালই ক্ষণভঙ্গুর! কত যায়, কত আসে; কিন্তু এবার গুর্জ্জর-জয়ে এমন একটা রত্ন গিয়াছে, যা' আপনার বা আমার ভাণ্ডারে আর ফিরিয়া আসিবে না। আজ হিন্দুরমণীর মস্তক হইতে একটা গৌরবের রশ্মি চিরকালের জন্য নামিয়া গিয়াছে। আজ গুর্জ্জরের মহিমময়ী রাজ্ঞী দিল্লীশ্বরের অঙ্কলক্ষ্মী! তাই আজ আমার এ চাঞ্চল্য!

কিন্তু রাণা, ভৎর্সনা বা দোষারোপ করিবার জন্যই আজ আমি এই পত্র লিখি নাই। বৃক্ষতলবাসী, নিরাশ্রয় পথিকের দোষারোপে চিতোরেশ্বরের আর কতটুকু চৈতন্য হইবে? আমার উদ্দেশ্য আজ আর একটু নিগূঢ়, ভাঙ্গিয়া বলিতেছি, শুনুন।—

চিতোর ও আলাউদ্দীন উভয়ই আমার শত্রু—আমি মনে করিয়াছি, এক আঘাতেই এই উভয় শত্রুকে নিপাত করিব। আমি এই উভয় শত্রুকে পরস্পরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিব! চিতোর দিল্লীর আঘাতে পড়িবে—দিল্লী চিতোরের পরাক্রমে, ধ্বংস প্রাপ্ত না হউক, অন্ততঃ হতবীর্য্য হইবে নিশ্চয়! আমি সেই নিস্তেজ শত্রুকে অতঃপর অন্যোপায়ে ধ্বংসের মুখে পাঠাইব। যাহাতে আলাউদ্দীন অক্ষতদেহে চিতোর বিজয় করিয়া ফিরিয়া আসিতে না পারে, সেই জন্যই আজ আমি পূর্ব্বাহ্নে আপনাকে এই খবর দিলাম। আলাউদ্দীন যত কেন প্রবল হউক না, আপনি প্রস্তুত থাকিলে, তাহার পক্ষে অক্ষতদেহে প্রত্যাবর্ত্তন সহজ হইবে না, জানি। সেই বিশ্বাসেই আজ আমি আলাউদ্দীনকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেছি।

আলাউদ্দীন আসিতেছে—চিতোর ধ্বংস হইবে নিশ্চয়,

কিন্তু মহারাণা, যদি পারেন, এই সুযোগে হিন্দু-ললনার গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। চিতোর আমার শত্রুতা করিলেও, হিন্দুরমণী আমার শত্রু নয়। তাঁহার ক্ষুণ্ণ গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য আজ আমি আপনার মুখাপেক্ষী হইতেও প্রস্তুত। শুনিয়াছি আপনাদের প্রাসাদেও কমলা-দেবীর মত এক রত্ন আছে—দেখিবেন তিনিও যেন দিল্লীর বেগম না হন!

আমার সমস্তটা প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির মধ্যে আপনার জন্য এইটুকু শুভ ইচ্ছা আছে। আলাউদ্দীন ও চিতোর নিপাত যাউক, কিন্তু কমলার কলঙ্ক বিধৌত হউক!

আপনি ছয় মাস কাল আলাউদ্দীনকে চিতোরে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, আমি দিল্লীর শেষ পাতরখানিও টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিব,—একথা নিশ্চিত জানিবেন! এই কথায় অবিশ্বাস করিবেন না। অবিশ্বাস করিলে আপনি মরিবেন, কিন্তু আপনার শত্রু জীবিত রহিয়া যাইবে!

আজ তবে বিদায়। যদি কখনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারি, তবে আবার আসিয়া সাক্ষাৎ করিব—আপনি আপনার গুর্জ্জর-জয় সম্পূর্ণ করিবার শেষ সুযোগ পাইবেন! আপাতত আপনি আলাউদ্দীনকে গোল্লায় পাঠাইবার উত্তম

বন্দোবস্ত দেখুন। এ কার্য্যে আমিই আপনার প্রধান সহায়!

করণ রায়।”

পত্র পড়িয়া মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ কতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। একি অভাবনীয় সংবাদ! মহারাণার কপোল-দেশে বিন্দু বিন্দু করিয়া ঘর্ম্মবারি সঞ্চিত হইতে লাগিল। সত্যই কি হিন্দু-গৌরব এইরূপে নিষ্পেষিত হইয়াছে?—গুর্জ্জরের এই পরিণাম! রাণার অন্তরের কোণে সেই চিরশত্রুর জন্যও এক জায়গায় একটু ব্যথা, কেন বলা যায় না, হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। রাণা কিংকর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অন্যমনস্কভাবে গৃহত্যাগ করিবেন, এমন সময় দ্বারে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, তখনও প্রহরী যুক্তকরে তেমনিই দাঁড়াইয়া আছে। রাণা কহিলেন, “মঙ্গল সিং, দূতের বিশ্রামের উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া দাও, আর তাঞ্জাম বোলাও, আমি এখনই পিতৃব্য ভীমসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।” তারপর একটু অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া একটু দৃঢ়স্বরে কহিলেন—“আর নগরপালকে ভাল করিয়া বলিয়া দাও, ঢেড়া পিটাইয়া এখনই হুকুম জারি করা হউক, আজ হইতে

নগরে আমোদ-প্রমোদ বন্ধ! যে কেহ এ আদেশ অমান্য করিবে, তাহাকে গুরুতর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।"

(২)

চিতোরের উপর চিতোরেশ্বরের পিতৃব্য রাণা ভীমসিংহের অসীম প্রতাপ। যখন লক্ষ্মণসিংহের পিতা মহাপ্রস্থান করেন, তখন চিতোরেশ্বর নিতান্তই বালক। তাই মুমূর্ষু মহারাণা ভীমসিংহের উপরেই লক্ষ্মণসিংহের লালন-পালনের ভার এবং রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া যান। সেই অবধি ভীমসিংহ রাণা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। কালে লক্ষ্মণসিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহারাণার আসন গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ভীমসিংহের রাণা নাম ঘুচে নাই, বা তাঁহার মর্য্যাদারও এতটুকু হানি হয় নাই।

এখনও চিতোরে যে কোন অনুষ্ঠানে ভীমসিংহের অভিমত গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তাঁহার উপদেশ ছাড়া প্রায় কোন কার্য্যই হয় না। যুদ্ধে তিনিই সেনাপতি, বিচারে তিনিই মন্ত্রী, সন্ধি-বিগ্রহে তিনিই পরামর্শদাতা।

মহারাণা আজ এই সমস্যায় পত্রখানি লইয়া তাঁহারই মন্দিরে যাইয়া দেখা দিলেন। ভীমসিংহ সাদরে রাণাকে উপবেশন করাইলেন।

অসময়ে রাণাকে স্ব-মন্দিরে দেখিয়া ভীমসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাণাজী, কি খবর ?"

রাণা কহিলেন,—"কাকাজী, খবর বিশেষ সুবিধাজনক নয়—বিভ্রাট ঘটিয়াছে ! আবার বুঝি যুদ্ধ বাধে !"

ভীমসিংহ কহিলেন,—যুদ্ধ বাধে, যুদ্ধ করিব, তার জন্য এত ভাবনা কেন ? ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধকে ভয় ! কিন্তু কি হইয়াছে, আগে বল শুনি।"

লক্ষ্মণসিংহ তখন ভীমসিংহকে গুর্জ্জরেশ্বরের পত্রখানি প্রদান করিলেন। পত্র পড়িয়া সেই সদাপ্রফুল্লমুখ প্রবীণ যোদ্ধার মুখ খানিও ম্লান হইয়া গেল।

ভীমসিংহ কহিলেন,—"কে এ পত্র লইয়া আসিল ?"

রাণা কহিলেন, "একজন রাজপুত। অনুমতি হয়ত তাহাকে সাক্ষাতে হাজির করি। আমি এখনও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই।"

ভীমসিংহ কহিলেন, "উত্তম করিয়াছ। আগে পরামর্শ করা যাক্—কি করা কর্ত্তব্য, তারপর দূতকে আহ্বান করা যাইবে। কমলাদেবী কেন এ সর্ব্বনাশ করিলেন ?"

রাণা কহিলেন,—"আর কেন ? মুসলমানে তাহাকে

ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এবার যুদ্ধ বাধিলে চিতোর যায়—আর থাকে, আমি একবার আলাউদ্দীনকে দেখিব—সে কতবড় দুষমন!"

ভীমসিংহ একটু অন্যমনস্ক ভাবে রহিলেন। তারপর কহিলেন, "দেখ রাণাজী, আমার মনে হয় এ ব্যাপারে সবটা দোষ শুধু আলাউদ্দীনেরই নয়—আরও একটা কেহ এ ব্যাপারে আছে! আলাউদ্দীনের আর কত শক্তি! গুর্জ্জরই না হয় সে বাহুবলে জয় করিয়াছে—কিন্তু ধর্ম্মরক্ষার উপায় তো কমলার হাতে ছিল।"

রাণার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। কহিলেন,—"তবে কি এ ব্যাপারে সবটা দোষই শুধু কমলাদেবীর?"

ভীমসিংহ কহিলেন, "না, আমার তা মনে হয় না। হিন্দুর শিক্ষা, হিন্দুর দীক্ষা, হিন্দুর সংস্কার, এক দিনে, বা এক মাসেই এমন ব্যর্থ হয় না। কমলাদেবী পাপিষ্ঠা নিশ্চয়—কিন্তু তথাপি আমার মনে হয়, এই পাপ দিনে দিনে, কালে কালে সঞ্চিত হইয়াছে! কালে কালে, পলে পলে সেই বাঁদী তাহার হৃদয়কে কলুষিত করিয়াছে।"

রাণার মুখখানি হইতে ক্ষোভের একটা ম্লান ছায়া হঠাৎ একটু খানি অন্তর্হিত হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার

চোখে-মুখে বিস্ময়ের মাত্রা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। রাণা কহিলেন—"সে আবার কে, কাকাজী ?"

ভীমসিংহ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "চল, ভেতরে চল। রাণা, আজ আমার একটা বহুদিনের কথা মনে পড়িতেছে। চল, তোমায় বল্‌বো, চল।"

(৩)

সেইদিন রাত্রিতে দুর্গের একখানি শ্বেতপাথরে বাঁধান অপূর্ব্ব দালানের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া একটী অপূর্ব্বা সুন্দরী রমণী আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন।

জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক্ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। নগরীর গৃহে গৃহে তখন দীপ নির্ব্বাপিত, কেবল অদূরে কীর্ত্তিস্তম্ভের চূড়ে সাঁজের বাতি তখনো ঝিকিমিকি করিয়া জ্বলিতেছে, আর রাস্তার ও ঘাটের পাশের বাতিগুলি নীরবে হাসিতেছে।

একটী পুরুষ আসিয়া ধীরে ধীরে রমণীর পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। পুরুষ নীরবে কতক্ষণ জ্যোৎস্নার আলোকে রমণীর সেই রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু রমণী তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। রমণী প্রকৃতির উপাসনায় মগ্ন! দূরে—আরাবল্লী পর্ব্বতের বিরাট্ কাল

দেহটার পশ্চাতে একখানি ততোধিক অন্ধকার-মাখা মেঘ ক্রমে উপরে উঠিতেছিল। রমণীর দৃষ্টি সেই দিকে।

পুরুষ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া করিয়া পরিশেষে রমণীর হস্ত ধরিলেন। কহিলেন, "পদ্মিনী, কি দেখিতেছ?"

রমণী ফিরিয়া চাহিলেন। অপূর্ব্ব কাল কাল আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষু দুইটী পুরুষের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া এক মুহূর্ত্ত নিবিষ্ট দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে দৃষ্টি ফিরাইয়া আবার আকাশের পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন,—"উঃ কি কাল মেঘ!"

রাজপুত দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। কহিলেন, "ভারতের আকাশেও এইরূপ একখানি কাল মেঘ উঠিতেছে; এইরূপই ক্রমে বাড়িতেছে!"

রমণী নীরব বিস্ময়ে আবার পুরুষের পানে চাহিলেন। কহিলেন, "ওকি অলক্ষণে কথা!"

পুরুষ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন—"অলক্ষণে হইলেও সত্য, পদ্মিনী! আলাউদ্দীনের প্রতাপ দিন-দিনই বাড়িতেছে। আলাউদ্দীন গুর্জ্জর জয় করিয়াছে!"

"হতভাগ্য গুর্জ্জর! এই সে দিন চিতোরের হাতে তোমার এতটা লাঞ্ছনা হইয়াছে—আবার মুসলমানের

হাতে পড়িলে!"—বলিয়া পদ্মিনীও উচ্চ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ভীমসিংহ তাঁহাকে বাহুপাশে আশ্রয় দিলেন।

ভীমসিংহ কহিলেন, "পদ্মিনী, বলিতে গেলে এ আমাদেরই দোষ! কে গুর্জ্জরকে এতটা শক্তি হীন করিয়াছে? সে চিতোর! চিতোরকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে! করণ-রায়ও আজ সেই কথা বল্‌ছিলেন।"

"করণ-রায়! গুর্জ্জরের রাজা!" বিস্ময়ে পদ্মিনীর ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি কোথায়?"

ভীমসিংহ কহিলেন, "তিনি এতক্ষণ দিল্লীতে! সকাল বেলা একজন দূত তাঁহার নিকট হইতে একখানি পত্র লইয়া আসিয়াছিল। পত্রখানিতে এই সকল কথা লেখা; তা'ছাড়া উহাতে আরও ভীষণ ভীষণ সংবাদ আছে। পদ্মিনী, তুমি সে সব কথা শুনিও না। শুনিলে ঘৃণায় তোমার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিবে। হিন্দুস্থানের পবিত্র অঙ্গে কালিমা লিপ্ত হইয়াছে!"

পদ্মিনী শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছে। গুর্জ্জররাজ কি তবে দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহার পদলেহন

করিবার জন্যই দিল্লীতে গিয়াছেন? অথবা তিনি বন্দী? আলাউদ্দীন তাঁহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়াই লইয়া গিয়াছে! কি হইয়াছে শীঘ্র বল! আমার শুনিবার বড় আগ্রহ হইয়াছে!"

ভীমসিংহ একটু মৃদু হাসিলেন। কহিলেন, "পদ্মিনী, আশ্বস্ত হও। করণ-রায় আজও দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন নাই—কিন্তু তাঁহার সুন্দরী পত্নী আনন্দের সহিত সে সৌভাগ্য মাথায় তুলিয়া লইয়াছে! দিল্লীশ্বর তাহাকেই পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া দিল্লীতে লইয়া গিয়াছেন!"

হঠাৎ পদ্মিনীর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। এতদূর! পদ্মিনী তো এ কথা কল্পনায়ও ভাবিতে পারেন নাই। এও কি সম্ভব? পদ্মিনীর মনে হইল, এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে একটা যুগ-প্রলয় হইয়া গেল। অথবা এ স্বপ্ন? পদ্মিনী আর ভাবিতে পারিলেন না। তাঁহার দেহ অবসন্ন-প্রায় হইয়া আসিল, হৃদয়ের স্পন্দন কমিয়া গেল—পদ্মিনী বসিয়া পড়িলেন। হিন্দু রমণীর এই কাণ্ড? গুর্জ্জর-মহিষীর এই পরিণাম! তবে আর পৃথিবীতে অসম্ভব রহিল কি?

ভীমসিংহ পদ্মিনীর মনের অবস্থা বুঝিলেন। কহিলেন,

"পদ্মিনী গৃহে চল। ঝড় আসিতেছে—এখন এভাবে এখানে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। হৃদয়ে বল সঞ্চয় কর —আরও কথা আছে। এস, হাত ধর।"

পদ্মিনী ভীমসিংহের হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন মেঘখানি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া চন্দ্রমণ্ডলটী গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল;—ঘোর অন্ধকার চারিদিক্ ঘেরিয়া আসিল। অন্যমনস্কভাবে পদ্মিনী বলিলেন, "এমন জ্যোৎস্না —সব শেষ!"

তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন।

একটা দমকা বাতাস সেই মুহূর্ত্তে আসিয়া চারিদিকের জানালা-কপাটগুলি আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিয়া সন্‌সন রবে প্রবল বেগে কোথায় বহিয়া গেল।

পদ্মিনী ও ভীমসিংহ উভয়েই কেমন একটা অনির্দ্দিষ্ট আতঙ্কের স্পর্শে একমুহূর্ত্তের জন্য শিহরিয়া উঠিলেন!

(৪)

নীচে মর্ম্মর পাথরের অপূর্ব্ব কক্ষ। সেই কক্ষে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব গজদন্তনির্ম্মিত আসন সকল বিস্তৃত রহিয়াছে, মেজে উত্তম গালিচায় মোড়া। একপার্শ্বে পিতলের প্রদীপে সুগন্ধি বাতি জ্বলিতেছে। ভীমসিংহ আসিয়া প্রদীপখানি

উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। কিন্তু পদ্মিনীর মন তাহাতে হাসিয়া উঠিল না।

সেই উজ্জ্বল কক্ষে একখানি জানালার সম্মুখে একটী আসন টানিয়া লইয়া ভীমসিংহ পদ্মিনীকে পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন; তারপর দূতের নিকট হইতে গুর্জ্জরের খবর যাহা যাহা পাইয়াছিলেন, সব বলিলেন। তারপর করণ-রায়ের সেই চিঠিখানির কথা বলিতে বলিতে ভীমসিংহ বলিয়া উঠিলেন,—"পদ্মিনী, তোমারও দিল্লীর বেগম হইতে সাধ যায় কি? এবার আলাউদ্দীন তোমারি জন্য সাজ-সজ্জা করিয়া আসিতেছেন; কমলার মত এবার তুমিও দিল্লীর মস্‌নদের একপার্শ্বে ঠাঁই পাইবে!"

কি নিষ্ঠুর বিদ্রূপ! পদ্মিনীর চোখ-মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। পদ্মিনী কহিলেন, "চিতোরে আসিলে আলাউদ্দীন এবার ভারী রকম একটা নূতন শিক্ষা লাভ করিয়া যাইবে। হিন্দুস্থানের প্রত্যেক নর-নারীই যে করণরায় বা কমলাদেবী নয়—সেটা এবার আলাউদ্দীনকে আমরা ভালরূপেই শিখাইয়া দিব; এবার আমরা কমলার অপমানের প্রতিশোধ লইব!"

ভীমসিংহ এ কথায় কিছু উত্তর দিলেন না। আর

একটা কি নূতন কথা তখন তাঁহার মনে একটু একটু করিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল; সেই কথাই তিনি ভাবিতেছিলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "পদ্মিনী, তোমার সেই মতিয়াকে মনে আছে কি? কমলাদেবীর সেই বাঁদী! আজ ছয় বৎসর হয়, একবার তীর্থের পথে আমরা কমলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, সেই সময় তাহার সঙ্গে একটা মুসলমান বাঁদী দেখিয়া তুমি চমকিয়া উঠিয়াছিলে—সেই মতিয়াকে তোমার মনে আছে?"

পদ্মিনী চমকিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "সেই বাঁদীকে দেখিয়া আমি কমলাকে বলিয়াছিলাম 'ম্লেচ্ছ-সংস্রবে তুমি নিপাত যাইবে—তবে কি সেই ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হইল?"

ভীমসিংহ কহিলেন—"আশ্চর্য্য কি? বাঁদীর সেই অপরূপ রূপ এবং জাঁক-জমক ও প্রাধান্যটা দেখিয়া তখনই আমাদের মনে হইয়াছিল, সে একদিন গুর্জ্জরের সর্ব্বনাশ করিবে! কিন্তু সর্ব্বনাশটা যে এভাবে আসিবে, তা' তখন বুঝিতে পারি নাই।"

পদ্মিনী হাসিয়া কহিলেন, "আমিও না। তুমি তখন মনে করিয়াছিলে, সে রূপে গুর্জ্জরেশ্বর দগ্ধ হইবেন।

আমিও সেরূপই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু এভাবে যে কথাটা——”

ভীমসিংহ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তীব্র বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন,—“সাধ্বী স্ত্রী আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া পতিকে রক্ষা করিয়াছে। মতিয়ার মায়াজালে কমলা স্বামীকে পতিত হইতে দেন নাই, সে কুহকমন্ত্রে নিজকেই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। মতিয়াই নিশ্চয় কমলাকে টানিয়া নরকের পথে লইয়া গিয়াছে!”

পদ্মিনীর অস্ফুট অধর-যুগলে কথা ভাল ফুটিল না। অস্পষ্টস্বরে পদ্মিনী কেবলমাত্র উচ্চারণ করিলেন,—“কিন্তু সেই কমলা!—সেই সরলা, সুশীলা, পুষ্পকোমলা ললনার এই কাজ! এ যে বিশ্বাসের অযোগ্য।”

ভীমসিংহ পদ্মিনীর হাতখানি ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া কোমলস্বরে কহিলেন,—“পদ্মিনী, তুমি কি জাননা, অবলা-সরলারাই কুহকের হাতে সব চেয়ে শীঘ্র ধরা দেয়, সব চেয়ে সহজে কুহকে বশীভূত হয়। তবে আর এ অবিশ্বাস কেন? যাক্—এস, আজ আর ওকথা নয়। ওই, চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে দ্বিপ্রহরের নহবৎ বাজিয়া উঠিয়াছে, রাত্রি অনেক হইয়াছে—বিশ্রাম করিবে চল।”

পদ্মিনী ও ভীমসিংহ উভয়েই উঠিয়া তখন পালঙ্কের নিকটে গেলেন।

সে রাত্রিতে আর তাঁহাদের একটীও কথা হইল না। আহারের পাত্রে আহার্য্য পড়িয়া রহিল, সরবতের পাত্রটী অন্য দিন এতক্ষণ নিঃশেষিত হইয়া যায়, কিন্তু আজ তাহা স্পর্শিতই হইল না, স্তবকে স্তবকে ফুলের মালা শয্যার শোভা বর্দ্ধনের জন্য সঞ্চিত ছিল—তাহারা তেমনি রহিল—কে তাহাদিগকে বিছানায় ছড়াইয়া দিবে? বাঁদীরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, পদ্মিনী তাহাদিগকে ডাকিলেন না। ভীমসিংহও পদ্মিনীর সম্মুখে একখানি আসনে অর্দ্ধেকখানি গা হেলাইয়া দিয়া চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। কোন্ সময়ে যে প্রদীপটী আবার অনুজ্জ্বল হইয়া একটা দমকা বাতাসে হঠাৎ নিবিয়া গেল, তাহা তাঁহাদের একবারেই অগোচর!

(৩)

পরদিন সকালবেলা রাজসভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভীমসিংহ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দেখিলেন, ভিতর হইতে তাঁহার ঘরের দ্বার বন্ধ!

দরজার নিকটেই শ্বেতপাথরের জালি-কাটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটী জানালা। তাহারই একটীর ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া

ভীমসিংহ দেখিলেন, ভিতরে বেশ দিব্য পা ছড়াইয়া বসিয়া পদ্মিনী রাণী মসী-মুদ্রা লইয়া কি লিখিতেছেন!

বাণীর চর্চ্চা করিতে ভীমসিংহ পদ্মিনীকে এই নূতন দেখিলেন। পদ্মিনী নামের সার্থকতা করিয়া চিরকাল তাহার গৃহে কমলার মতই বাস করিয়াছে! আজ তাঁহাকে এই মূর্ত্তিতে দেখিয়া ভীমসিংহের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

ভীমসিংহ ডাকিলেন, "পদ্মিনি!" পদ্মিনী ছুটিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি শশব্যস্তে দ্বার খুলিয়া দিলেন। কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিয়া ভীমসিংহ আর পদ্মিনীর হস্তে সিপিকা-খানি খুঁজিয়া পাইলেন না।

ভীমসিংহ কহিলেন, "কমলা যে আজ সপত্নী-বিদ্বেষ ভুলিয়া বাণীর সঙ্গে বেশ মিত্রতা করিয়াছে, দেখিতেছি! ব্যাপারখানা কি?"

পদ্মিনী শুভ্রদন্তপংক্তি বাহির করিয়া একটু মৃদুভাবে অধর চাপিয়া কহিলেন, "বাহিরের গোলযোগ দেখিয়া ভিতরের গোলযোগ মিটাইয়া ফেলিতে হইয়াছে, নতুবা যে সব যায়!"

ভীমসিংহ একটু হাসিয়া সুর বদলাইয়া আবার কহিলেন, "সেতো ভাল কথা! লাভটা তবে দেখিতেছি

৫২৭৭

আমারই বেশী। একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? তা তোমাদের মিলটা কেমন হইল, একটু নমুনা দেখিতে পারি কি? লিপিখানা কি উড়াইয়া দিয়াছ?"

পদ্মিনীর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। একবার মাটির দিকে চাহিয়া, একবার বাহিরের দিকে তাকাইয়া, একবার ভীমসিংহের মুখের দিকে কাল কাল, বড় বড় চক্ষু দু'টী স্থির করিয়া পদ্মিনী হঠাৎ হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "না না, তা হইতে পারে না। আমাদের সে কথা প্রকাশ হইলে যে সব পণ্ড হইয়া যায়—তাও কি হয়?" বলিয়া পদ্মিনী বক্ষের ভিতর হইতে লিপিখানি বাহির করিয়া হাতের ভিতরে আরও বেশ শক্ত করিয়া ধরিলেন।

ভীমসিংহ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি আর কখনও পদ্মিনীকে এ ভাবে দেখেন নাই। আজ তাঁহাকে আত্ম-গোপনে এতটা উৎসাহিনী দেখিয়া তাঁহার কৌতূহলটা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় জাগিয়া উঠিল। "হয় বৈকি পদ্মিনী" বলিয়া ভীমসিংহ হাসিতে হাসিতে তাঁহার বাহুযুগল আক্রমণ করিলেন। দক্ষিণহস্তে পদ্মিনীর দক্ষিণ হস্তটীকে বন্দী করিয়া পৃষ্ঠের উপর দিয়া বাঁ হাতখানি

লইয়া গিয়া তাঁহার অপর হাতখানিও—যেখানে লিপিখানি মুষ্টিবদ্ধ হইয়াছিল—ধরিবার উপক্রম করিলেন।

পদ্মিনী কহিলেন,—"ছাড়, ছাড়! ও কি জবরদস্তি? এখনি বাদশাহের কোপে পড়িবে যে! আমি লুকাইয়া আলাউদ্দীনকে একখানি পত্র লিখিয়াছি। তোমাকে দেখাইলে কি রক্ষা আছে?"

ভীমসিংহ হঠাৎ পদ্মিনীর হস্ত পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বিস্ফারিত দৃষ্টির মধ্যে প্রকাণ্ড একটা উজ্জ্বল কৌতুক কালমেঘের মত একখানা বিস্ময়ের ছায়া লইয়া আসিয়া দেখা দিল।

কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তমাত্র। তার পরই সমস্তটা কৌতুকের ঔজ্জ্বল্যের ভিতরে সে ছায়া খানি কোথায় মিলাইয়া গেল।

ভীমসিংহ হাসিয়া কহিলেন,—"পদ্মিনী, এক দিনেই যে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছ দেখিতেছি? আলাউদ্দীন যাদু জানে নিশ্চয়! কিন্তু মনে রাখিও, এবার আলাউদ্দীন আসিলে যদি সন্ধি করিতে হয়, তবে সে সন্ধি-উপলক্ষে আলাউদ্দীনের শিবিরে রাজপুতের প্রথম উপঢৌকন তুমি!"

পদ্মিনীও হাসিলেন। মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "তথাস্তু! আমি রাণার রাজভক্ত

প্রজা—তাঁহার বিধান কখনও অমান্য করিব না। চিতোর যদি সন্ধিই চায়, তবে পদ্মিনীর জন্য সে সন্ধি কখনও পণ্ড হবে না, ইহা নিশ্চয় জানিও; চিতোর না কহিতে, আমি আত্মসমর্পণ করিব। কিন্তু আপাততঃ আমার বক্তব্য এই যে—সে দুর্ম্মতি যেন চিতোরের কখনও না হয়। চিতোরের এই গর্ব্বোন্নত মস্তক, চিরকাল যেন গর্ব্বোন্নতই থাকে, তার এই উঁচু মাথাটা এই সাড়ে তিন শত হাত উঁচু দুর্গ-চূড়ার মতই যেন সমস্ত রাজপুতের দেশটার উপরে উঁচু হইয়া সকলকে অভয় দেয়—অন্যের অভয় যেন তাকে কখনও যাচ্ঞা বা ক্রয় করিয়া লইতে না হয়। আর যদি এমনই হয় যে তাকে একান্ত পড়িতেই হইবে, তবে যেন সে এমনই ভাবে অতলে গড়াইয়া পড়ে, যে তাহার পদচিহ্নটুকুও শত্রুর দৃষ্টিকে উপহাস করিয়া যায়—বারেকের তরেও ধরা না দেয়। তবেই তার সে পড়াতেও এতটুকু রাজপুতের গর্ব্ব করিবার থাকিবে—এতটুকু মনুষ্যত্ব থাকিবে!"

বলিতে বলিতে পদ্মিনীর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ভীমসিংহ একটা পরিহাসের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এমন ভাবে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড আগ্নেয় গিরির গোড়ে আসিয়া

ঠেকিবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। হঠাৎ কেমন হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাঁহার বোধ হইল, পদ্মিনীর কথাগুলি হইতে প্রবল একটা তাড়িত স্রোত আসিয়া তাঁহার রক্তবিন্দুগুলিকে উস্কাইয়া দিতেছে!

পদ্মিনী একটু থামিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিলেন। তারপর আবার বলিলেন,—"এ পত্র আলাউদ্দীনকে নয়, এ পত্র কমলাকে লিখিয়াছি। শুনিলাম, গুর্জ্জরের দূত আজ দিল্লী ফিরিয়া যাইতেছে, তাই পোড়ারমুখীকে একটা আশীর্ব্বাদ করিয়া পাঠাইলাম। আশা করি, ইহাতে শুভ ফল ফলিবে। তুমি পত্রখানি দেখিতে চাহিয়াছিলে, দেখ, তোমার নিকট আমার কি গোপনীয় আছে? কিন্তু দূতকে বলিয়া যাহাতে এটা কমলার নিকটে শীঘ্র পৌঁছে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দাও। তোমার নিকট আমার এই অনুরোধ।"

ভীমসিংহ পত্রখানি হাতে লইয়া ভাবিতে লাগিলেন। দিল্লীর সহিত বিরোধের সূচনা উপস্থিত—এখন এই প্রকারে যে কোন লিপিই তথায় পাঠান সঙ্গত কিনা? আর পাঠাইলেও একজন শত্রুপক্ষীয় অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সঙ্গে কি পাঠান কর্ত্তব্য? ভীমসিংহ বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত

হইতে পারিলেন না। পদ্মিনী তাঁহার মনের কথা বুঝিলেন। কহিলেন, "রাণা, এত ভাবনা কিসের? রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের কথা ভাবিতেছেন? আলাউদ্দীনকে নিমন্ত্রণ তো ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে, এখন আর অধিক অমঙ্গলের কি সম্ভাবনা আছে? আলাউদ্দীন যদি আসিবেই, তবে বীরপুরুষের মত তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাই ঠিক? কাপুরুষ ভাবিয়া সে যে একবারে গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ভ্রূকুটী দেখাইবে—সে সুযোগ তাঁহাকে কেন দিতে যাইব? করণরায় আলাউদ্দীনকে চিতোর-জয়ে উত্তেজিত করিতে গিয়াছেন, যাউন, কিন্তু আলাউদ্দীন যখন সঙ্গে-সঙ্গেই আবার আমাদের এই পত্রখানি পাইবেন, তখন বুঝিবেন, করণরায় বা আলাউদ্দীনের শত্রুতা যত কেন ভীষণ হউক না, চিতোরকে কখনও ভয় দেখাইতে পারে না, চিতোরকে তাহারা স্পর্শও করিতে পারে না। বিপদের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেই চিতোরের আমোদ—বিপদের সঙ্গে ক্রীড়া করিবার জন্যই চিতোর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। নিতান্ত গোঁয়াড়ের মত খেয়ালের হুজুগে চিতোরে আসাটা তাঁহার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নহে।"

এমন একটা নূতন যুক্তি পদ্মিনীর নিকট হইতে শুনিবেন, ভীমসিংহ ইহা স্বপ্নেও কখনো ভাবেন নাই—তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন। কথাটা কি ঠিক? তিনি একবার পদ্মিনীর দিকে ও একবার পত্রখানির দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে ভীমসিংহের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; একটা গর্ব্ব ও স্ফূর্ত্তির আলোক তাঁহার সমস্তখানি দেহকে প্রভাময় করিয়া তুলিল। পত্র শেষ করিয়া ভীমসিংহ কহিলেন,—"পদ্মিনি, তুমি পদ্মিনীই বট। পদ্মের সৌরভের মতই তোমার গুণগ্রাম চিতোরকে আমোদিত করিয়া তুলিবে। আলাউদ্দীনের সাধ্য নাই, তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে। আমি তোমার পত্র পাঠাইব।"

ভীমসিংহ এই বলিয়া পত্রখানি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পদ্মিনী স্তব্ধ হইয়া পালঙ্কের একখানি দণ্ড ধরিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে জানালার দিকে অগ্রসর হইলেন।

দেখিলেন, সেই পাষাণ-নির্ম্মিত চারু অট্টালিকার চারিদিকে কুণ্ডের জল কি স্থির, কি ধীর! অদূরে মেঘের

গর্জ্জন শোনা যাইতেছে, দুর্গের উপরে একটী রক্ত-পতাকা সমীরণে দুলিতেছে, কিন্তু নীচে এতটুকুও হাওয়া নাই। সমস্তটা দৃশ্য স্তব্ধ, নীরব। পদ্মিনী ভাবিলেন,—একি প্রলয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ?

পদ্মিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

বিদ্যুৎ

(১)

যমুনার তীরে দিল্লীর উন্নত ছবিখানি বড় সুন্দর। উপরে নীল আকাশ, সম্মুখে নীল কালিন্দী, ওপারে সবুজ রং-এর বিস্তীর্ণ মাঠ, এমন সুন্দর সুন্দর পরিজনমালায় বেষ্টিত পাঠান বাদশার চারু অট্টালিকাগুলি কি মনোরম হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে!

সেই পৃথ্বীরাজের দিল্লী আর নাই। অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব চারু-শিল্পমণ্ডিত হিন্দুমন্দিরগুলির জীর্ণকঙ্কাল এখন বাদশাহের মহল পুষ্ট করিতেছে। আগে যেখানে মন্দির ছিল, এখন সেখানে মসজিদ্ উঠিয়াছে, আগে যেখানে জয়স্তম্ভ ছিল, এখন সেখানে মিণার হইয়াছে, আগে যেখানে অতিথিশালা ছিল, এখন সেখানে সরাই।

প্রাসাদের এক পার্শ্বে, যমুনার অনতিদূরে অন্দর মহল। পারস্যের ফুল গাছ, ইরাণের গালিচা, এবং ইস্পাহানের শত আসবাব-পত্র সে অন্দর মহলকে স্বর্গের বৈচিত্রে ভরিয়া রাখিয়াছে। বাসোরার গোলাপ জল, কান্দাহারের মৃগনাভি এবং কাশ্মীরের নীলোৎপলের সুবাসে রঙ্গমহল সদাই ভরপূর।

এই রঙ্গমহলেরই এক প্রকোষ্ঠে যমুনার শীতল হওয়ায় গজদন্তের পালঙ্কের উপর শুইয়া দিল্লীর প্রধানা বেগম একদিন দিব্যি আরামে ঘুমাইতেছিলেন। প্রাচীরের মধ্য দিয়া একটী শ্বেতপাথরের ছোট নল মহলে প্রবেশ করিয়াছে —তাহারই ভিতর দিয়া সন্তর্পণে একটী বারিধারা ভিতরে ঢুকিয়া পালঙ্কের অদূরে একটা পদ্মের মত সুন্দর মর্ম্মরাধারে চূর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। উহার

কণিকাবিন্দুগুলি বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া নির্ম্মল নীহারকণার মত কক্ষটীকে স্নিগ্ধ করিতেছে।

হঠাৎ একটী পরিচারিকা পা টিপিয়া টিপিয়া সেই নিদ্রাস্তব্ধ অপূর্ব্বকক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল।

পরিচারিকার হাতে একখানি পত্র। অতি সন্তর্পণে পত্রখানি বস্ত্রান্তরালে লুকাইয়া বাঁদী একবার বেগমের দিকে ও একবার পশ্চাতে বাহিরের দিকে চাহিল, তারপর একটা আশ্চর্য্য ব্যস্ততার সহিত বেগমের মস্তকের নিকটে পত্রখানি রাখিয়া বিদ্যুতের মত চকিতে সরিয়া পড়িল।

এক মুহূর্ত্তে এই কাণ্ডটী হইল।

কেহ কোথাও ব্যাপারটী লক্ষ্য করিল না। বেগম যেমন ঘুমাইতে ছিলেন, তেমনি ঘুমাইতে লাগিলেন; যমুনার বারিধারা যেমনি মর্ম্মরাধারে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল, তেমনই চূর্ণ হইতে লাগিল; অপরাহ্ণের সমীরণ সলিলকণা লইয়া যেমনই ক্রীড়ায় মত্ত ছিল, তেমনি মত্ত রহিল। ক্রমে দিবা অবসানপ্রায় হইয়া আসিল।

শেষবেলার নহবতের ধ্বনি শুনিয়া বেগম যখন চক্ষু মর্দ্দন করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে গেলেন, তখন পৃষ্ঠের নীচে একটা কি কঠিন পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করিলেন।

পৃষ্ঠের নীচে হাত দিয়া জিনিসটা বাহির করিতেই দেখিলেন—একখানি পত্র! আবেশমাখা চক্ষু দু'টী আবার একটু মর্দ্দিত করিয়া পত্রখানির দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু প্রথমে সরল ছিল, ক্রমে কুঞ্চিত হইয়া আসিল। ক্রমে বেশ একটা বিস্ময়ের আলোক তাহাতে ফুটিয়া উঠিল।

পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে যাইয়া বেগম হঠাৎ থামিয়া গেলেন। ও কি ভাষা? সে আরবীও নয়, ফারসীও নয়—খাটী হিন্দু-স্থানী! নাগরী অক্ষর দেখিয়া বেগম পত্রখানি গুছাইয়া রাখিয়া আবার শয্যার উপরে কাত হইয়া পড়িলেন। তারপর ডাকিলেন,—"ডালি!"

কাহারও কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। বেগম বিরক্ত হইয়া ভ্রূকুটী করিয়া আবার অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে ডাকিলেন,—"বাঁদি!"

এবার একটী বালিকা চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে শশ-ব্যস্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল,—"কি বেগম সাহেবা?"

বেগম বাহুতে ভর দিয়া অর্দ্ধ উপবেশন করিয়া পত্রখানি বাঁদীকে দিলেন। তারপরে কহিলেন,—"এটা কোথা হইতে আসিল?"

পত্রখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া, বাঁদী ভারি বিস্মিত হইয়া গেল। কহিল,—"এটা কি ?"

চক্ষে তাহার তখনও একটু আবেশের ছায়া স্পষ্ট ধরা যাইতেছিল, সেটুকু লক্ষ্য করিয়া অধর দংশন করিয়া বেগম উত্তর করিলেন,—"এটা শূলে দিবার পরওয়ানা! যারা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া পাহারা দেয়, তাহাদের জন্যে এটার বন্দোবস্ত হইয়া থাকে!"

বাঁদী কাঁপিতে লাগিল। কহিল, "দোহাই বেগম সাহেবা, আমি ইচ্ছা করিয়া ঘুমাই নাই। সরাবের মধ্যে নিশ্চয় কিছু ছিল—এখনও আমার মাথাটা 'কনকন' করিতেছে। দোহাই রাণীজী! গোস্তাকী মাফ হয়—আমি জানি না—"

বেগম উঠিয়া বসিলেন। দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—"সরাব! সরাব!—কে তোকে আজ সরাব দিয়াছে বল—শূলটা তবে তাহারই জন্য—"

বাঁদী। আমি নিজেই মালখানা হইতে লইয়া আসিয়াছি—কেহ দেয় নাই। কিন্তু কেহ উহাতে কিছু মিশাইয়া রাখিয়াছিল, ঠিক। নতুবা একপাশে এমন আলগা হইয়া পেয়ালাটা পড়িয়া থাকিত না; বা ওটা খেয়েও আমার গাটা এমন ছম্‌ছম করিয়া উঠিত না।

বেগমের ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিয়া গেল। "চুপরও হারামজাদী"—বলিয়া বেগম অস্থিরভাবে উঠিয়া আসিয়া বাঁদীকে ছোট একটী লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিলেন। তারপর "মরতে স্থান নাই, আমার দুয়ারে বাঁদীগিরি করিতে আসিয়াছিস্?—সরে যা বল্‌ছি!" বলিয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিলেন।

রাত্রিতে যখন বাদ্‌শাহ রঙ্গমহালে বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন তাঁহার হস্তে পত্রখানি দিয়া বেগম কহিলেন—"এটা কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে। লেখাটা নাগ্‌রী! ব্যাপারখানা কি ভাল বোঝা যাইতেছে না।"

আলাউদ্দীন কহিলেন, "তুমি হিন্দু-মহিলা হইয়া নাগরী জান না? এ যে তোমাদেরই দেশের ভাষা!"

বেগম একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া, মধুর কণ্ঠে কক্ষ আমোদ করিয়া কহিলেন—"আমি লেখা-পড়া জানি না! তুমি হিন্দু শাস্ত্র শুনিয়াছ—কমলার সঙ্গে সরস্বতীর কি সম্বন্ধ জান, তাই আমার লেখাপড়া শেখা হয় নাই।"

আলাউদ্দীন হাসিয়া পত্রখানি নিজের বস্ত্রের ভিতরে পুরিয়া কহিলেন,—"বটে? আচ্ছা তবে জাহান্নমে যাক্ তোমার সরস্বতী! কমলার বলেই আমি দিগ্বিজয় করিব।

কাল আমি দুনিয়ার পণ্ডিত একত্রিত করিয়া ঘোষণা করিয়া দিব যে, যে এ পত্রের তর্জ্জমা করিতে পারিবে, তাহাকে শতমুদ্রা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে—যে না পারিবে সে শূলে যাইবে!

(২)

সেইদিন রাত্রিতে যমুনার বাঁধা ঘাটের উপর বসিয়া এক জ্যোতিষী পুথি-পাঁজরা বন্ধ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। ঘাটের লোকজন একে একে সকলেই সরিয়া পড়িয়াছে, স্থানটী প্রায় নির্জ্জন হইয়া গিয়াছে, শুধু সেই জ্যোতিষী নড়িতে চড়িতেছে না—এক দৃষ্টে আকাশের দিকেই চাহিয়া আছে। যমুনার কাল জল তরঙ্গে তরঙ্গে আসিয়া তাহার পদতলে মধুর সঙ্গীত ছড়াইতেছে।

একটী রাজপুত আসিয়া কোথা হইতে ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। জ্যোতিষী তাহার দিকে চাহিয়া চমকিয়া কহিল, "এই যে তুমি আসিয়াছ! এত বিলম্ব করিলে কেন?"

রাজপুত কহিল, "আমি কালই সহরে পৌঁছিয়াছি, কিন্তু একটু কার্য্যে বিলম্ব হইয়া পড়িল।"

জ্যোতিষী কহিল,—"এ মুল্লুকে তো এই নূতন আসিলে

দেখিতেছি! ইহারই মধ্যে আবার কি কার্য্য জুটাইয়া বসিলে!"

রাজপুত কহিল, "পদ্মিনী-রাণী রাণী-মার নিকটে এক-খানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। আসিবার কালে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম, তাঁহার পত্র নির্ব্বিবাদে রাণী-মার নিকটে পৌঁছাইয়া দিব। তাই দেরী হইল।"

জ্যোতিষীর চক্ষু বিস্ময়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কতক্ষণ নীরবে রাজপুতের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জ্যোতিষী কহিল—"রাণী-মা কাহাকে কহিতেছ? কমলাকে? বরং বেগম-মা বল। কমলা এখন দিল্লীর বেগম! গুর্জ্জরের কমলা ওই পাঠান-কেল্লার ভিতরে আজ নির্ব্বিবাদে পাঠান দৈত্যদের সঙ্গে গৃহস্থালী করিতেছে!—গুর্জ্জরের সঙ্গে আর তার সম্পর্ক কি? কিন্তু যাক—পদ্মিনী এখন কমলাকে কি চিঠি লিখিয়াছে সে কথা বল? সে পত্র কই?"

রাজপুত মস্তক অবনত করিল। কহিল—"পত্র আমি পড়ি নাই। এইমাত্র একজন বাঁদীকে বাধ্য করিয়া গোপনে উহা রাণী-মার নিকটে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছি!"

"মূর্খ! করিয়াছ কি?" বলিয়া জ্যোতিষী কতক্ষণ ক্ষুব্ধভাবে মৌন হইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে কহিল

"ভগবান্ উপায় জুটাইয়া দিয়াছিলেন, তোমার নির্ব্বুদ্ধিতায় উহা পণ্ড হইল, দেখিতেছি। যাক্—আমার পত্র রাণাকে দিয়াছিলে তো?"

রাজপুত সঙ্কুচিত স্বরে কহিল—"হাঁ মহারাজ, দিয়াছি। চিতোরীরা এখনই সমর সজ্জা করিতেছে!"

জ্যোতিষীর মুখ আবার একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল,—"করুক, করুক, ভাল করিয়া করুক—এই শেষ! আর তো কখনো এ সুযোগ পাইবে না—এইবার যথাসাধ্য সাধ মিটাইয়া লউক।"

একটা পৈশাচিক জিঘাংসার ছায়া জ্যোতিষীর মুখখানিকে অত্যন্ত ভীষণ করিয়া তুলিল! জ্যোতিষী উঠিয়া, পুঁথি-পত্রগুলি গুছাইয়া রাজপুতকে পুনঃ কহিল, "এস, আর এখানে নয়—চল, গৃহে চল—সেই খানে সকল কথা আরও ভাল করিয়া শোনা যাইবে। এখন অনেকটা অগ্রসর হওয়া গিয়াছে—ইন্ধন প্রায় প্রস্তুত—এইবার আগুন ধরাইব।"

রাজপুত জ্যোতিষীর সঙ্গে সঙ্গে নগরে প্রবেশ করিল।

(৩)

পরদিন সকাল-বেলা জ্যোতিষী খুব আড়ম্বরপূর্ব্বক

বেশ-ভূষা করিয়া পাঠান বাদশাহের প্রাসাদের নিকটে চকের ভিতরে আসিয়া দেখা দিল, তারপর কতক্ষণ এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিল। এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া তাহার কানে কানে কি কহিল। জ্যোতিষী তখনই চঞ্চল হইয়া আবার প্রাসাদের দিকে চলিল। এবার জ্যোতিষী একবারে সদর দরজার ধারে, যেখানে শান্ত্রীরা বড় বড় তলোয়ার খুলিয়া পাহারা দিতেছিল, উপরে নহবতে অপূর্ব্ব প্রভাতী সঙ্গীত বাজিতেছিল, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর বসিবার জন্য এদিক্‌ওদিকে স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

এমন সময় একজন সওয়ার আসিয়া তাহাকে কহিল, "এইয়ো, তোম্ হিন্দুস্থানী হ্যায়? চলো হামারা সাথ, দরবার মে চলো—বাদশাকা হুকুম হ্যায়—আভি যানে হোগা।"

সোয়ারের এই অসম্ভাবিত হুকুমে জ্যোতিষী বড় একটা আশ্চর্য্যান্বিত হইল না, বা বিশেষ একটা আপত্তিও করিল না। শুধু কহিল, "কাহে কোতোয়ালজী? কেয়া হুয়া বলিয়ে তো?"

অন্য সময়ে এরূপ প্রতিবাদে অশ্বারোহী অবশ্য তাহাকে বেত্রাঘাত করিত, কিন্তু জ্যোতিষী এখন একবারে

তাহাকে কোতোয়ালজী সম্বোধন করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং রাগ করিতে পারিল না। অশ্বারোহী কোতোয়ালও নয়, ফৌজদারও নয়, কিন্তু তথাপি গোঁপে চাড়া দিয়া কহিল, —"আরে আউর কা হোগা, বাদসাকা হুকুম হ্যায়—ব্যস! চলো।"

জ্যোতিষীও তখন "ব্যস চলো!" বলিয়াই অশ্বারোহীর সঙ্গে সঙ্গে কেল্লায় প্রবেশ করিল।

তখন ফটকের নহবতটা বিপুল গর্জ্জনে বাজিতেছে; জ্যোতিষীর বোধ হইল, সে যেন প্রভাত সঙ্গীত নয়—লড়াইয়ের বাজনা!

(৪)

বাদশাহের নিকটে আসিয়া জ্যোতিষী খুব একটা লম্বা কুর্ণিস করিয়া দাঁড়াইল। তারপর কহিল, "শাহেন সা, আমি আপনার পত্রের তর্জ্জমা করিয়া দিব।"

বাদশাহ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "পত্রের তর্জ্জমা করিতে হইবে, এ কথা তোমায় কে কহিল?"

জ্যোতিষী বগলের নীচেকার ক্ষুদ্র পুটুলীটী দেখাইয়া কহিল—"এই পুঁথি-পাঁজরাগুলি। এ গুলির সাহায্যে আমি দুনিয়ার খবর জানি—আপনার মনের কথাও টের পাইয়াছি!

বাদশাহ কহিলেন,—"ভাল, তুমি উত্তম গণক বট। কিন্তু সাবধান, আমার সহিত প্রতারণা করিলে শূলে যাইবে। এই পত্রখানির ঠিক ঠিক তর্জ্জমা করিতে পারিবে তো ? ভাল তর্জ্জমা হইলে একশত আসরফি বকসিস্ দিব।"

জ্যোতিষী হাত বাড়াইয়া পত্রখানি লইল। সাত রাজার ধন এক মাণিক পাইলে লোকের যেমন আনন্দ হয়, এই পত্রখানি পাইয়া জ্যোতিষীর তদ্রূপ আনন্দ হইল। জ্যোতিষী পত্রখানি বস্ত্রের অভ্যন্তরে লুকাইল।

বাদশাহ কহিলেন, "ভাল, আজ তুমি ইহা গৃহে লইয়া যাও, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি, তাহারা তোমার গৃহ দেখিয়া আসিবে। কিন্তু কল্য প্রাতে আমি ইহার তর্জ্জমা চাই, না পাওয়া গেলে, তোমার ভিটায় ঘুঘু চরাইব।"

জ্যোতিষী কহিল, "শাহেন সা, কল্য প্রাতেই তর্জ্জমা হাজির করিব; চিন্তা করিবেন না, এ অতি সামান্য ব্যাপার! কতক্ষণই বা লাগিবে।"

বাদশাহ সন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন, "তোমাকে কাজের লোক বলিয়াই বোধ হইতেছে। কিন্তু একটা কথা এখনই জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তুমি তো গণক—গুণিয়া বল না, এ পত্র কোথা হইতে আসিল ?"

জ্যোতিষী কতক্ষণ মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল,—"জাঁহাপনা, এ পত্রখানি এক রমণীর! চিতোরের রাণী পদ্মিনী, গুর্জ্জরী বেগমকে লিখিয়াছেন!"

বাদশাহ কহিলেন,—"চিতোরের রাণী পদ্মিনী! ভীমসিংহের বনিতা? যার রূপের কথা এত শোনা যায়?"

জ্যোতিষী কহিল,—"কেবল রূপ নয় জাঁহাপনা, গুণেও পদ্মিনীর সমতুল ভারতে আর দ্বিতীয় নাই।"

বাদশাহের মুখ গম্ভীর হইল। কহিলেন, "ওটা কথার কথা মাত্র! আমার গুর্জ্জরী বেগমের চেয়ে আর সুন্দরী কোন রাজার ভাণ্ডারে নাই।"

জ্যোতিষীর মুখে একটা প্রেতালোক জ্বলিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া জ্যোতিষী কহিল,—"গোস্তাকি মাপ হয় জাঁহাপনা, দুই রাণীই আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, গুর্জ্জরী বেগম পদ্মিনীর নখাগ্রেরও যোগ্য নয়!"

একি আস্পর্দ্ধা! আলাউদ্দীন হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া অর্দ্ধ উত্থিত হইয়া গেলেন। কহিলেন,—"অপরে একথা কহিলে, আমি এখনি তার মুণ্ড লইতাম। কিন্তু তুমি গণক, তোমাকে দিয়া আমার প্রয়োজন আছে, তাই এ যাত্রা

বাঁচিয়া গেলে। মুখ সামাল করিয়া এখন যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহার জবাব দাও? এ পত্র কি করিয়া কমলার গৃহে পৌঁছিল?"

জ্যোতিষী আবার কতক্ষণ মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে কহিল,—"জাঁহাপনা, এক রাজপুত চিতোর হইতে এ পত্র বহন করিয়া আনিয়া একজন বাঁদীর দ্বারা গোপনে বেগমের ঘরে ফেলিয়া দিয়াছে।"

আলাউদ্দীন ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন—"বাঁদী! মহলের ভিতরে বিশ্বাসঘাতকতা! কে সে বাঁদী—শীঘ্র বল?"

জ্যোতিষী কহিল,—"সে যেই হউক, অতি চতুর লোক! অতি কৌশলে এ কাজ করিয়াছে। তাহাকে ধরা নিতান্ত সহজ হইবে না! বেগমের পরিচারিকাকে সরাবের সহিত বিষ খাওয়াইয়া তবে ঘরে ঢুকিয়াছে।"

আলাউদ্দীন ভাবিতে লাগিলেন। কমলা বাঁদীর নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছিল, তবে সবই সত্য! গণকের ক্ষমতায় আলাউদ্দীন সন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন,—"তুমি উত্তম গণক বট। এখন সে বাঁদীর নামটা শীঘ্র বল।"

জ্যোতিষী কহিল, "জাঁহাপনা, আমাদের গণনা অত কড়ায় গণ্ডায় সব রহস্য ভেদ করিয়া দেয় না। তাহা হইলে

সংসার চলে না। সে বাঁদী কে—সে অনুসন্ধান জাঁহপনার কোতোয়াল করিবে!"

আলাউদ্দীন কহিলেন—"আচ্ছা বেশ!—সে কার্য্যের ভার কোতোয়ালেরই রহিল। কিন্তু শেষ একটা কথার আভাষ তোমার নিকট হইতে জানিতে চাই। পদ্মিনীর উদ্দেশ্যটা কি? এমন ভাবে, এত হাঙ্গামা করিয়া যে সে বেগমকে পত্র লিখিল, ইহার ভিতরে নিশ্চয়ই একটা কোন বিশেষ রহস্য আছে। তাহারও বেগম হইবার ইচ্ছা আছে না কি?"

কথাটা বলিয়া আলাউদ্দীন কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে জ্যোতিষীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জ্যোতিষী হঠাৎ জোরে মাটীর উপর একটী ক্ষুদ্র পদাঘাত করিল।

জ্যোতিষী কহিল,—"এ প্রশ্নের উত্তর জাঁহাপনা কাল তার চিঠিতে পাইবেন। পদ্মিনী রাজস্থানের গৌরব-কুসুম; তাঁহাকে লাভ করা হিন্দুস্থানের বাদশার পক্ষেও যে সহজ হইবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না!"

জ্যোতিষীর ব্যবহারটা ক্রমেই আলাউদ্দীনের নিকটে একটু জটিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। একটা আহত আত্মাভিমানের উত্তেজনায় এবার আলাউদ্দীন একবারে

উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন,—"কি এত বড় কথা? হিন্দুস্থানের বাদশাহের অসাধ্য একটা তুচ্ছ নারীকে লাভ করা! আচ্ছা, দেখা যাইবে!"—বলিয়াই কয়জন সৈনিককে জ্যোতিষীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিয়া বাদশাহ অন্দর মহলে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

জ্যোতিষী অগত্যা সেই সৈনিকদের সঙ্গে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

তাহার চক্ষে তখন একটা প্রচ্ছন্ন অস্বাভাবিক আনন্দের ঢেউ মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া দিতেছিল।

(৫)

গৃহে আসিয়া জ্যোতিষী দরজা বন্ধ করিয়া পদ্মিনীর পত্রখানি খুলিলেন। পত্র পড়িয়া তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। জ্যোতিষী দেখিলেন, তিনি যাহা চাহিতেছিলেন, পত্রে অবিকল তাহাই লিখিত রহিয়াছে!

এ জ্যোতিষী যে গুর্জ্জরেশ্বর করণ-রায় ভিন্ন অপর কেহই নহে, তাহা বোধ হয় এতক্ষণে পাঠক পাঠিকাদিগের বেশ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। করণ-রায় দেখিলেন আলাউদ্দীনকে চিতোরে নিমন্ত্রণ করিবার ভার পদ্মিনী স্বয়ং লইয়াছেন। মাথা খাটাইয়া ফিকির করিয়া তাহাকে আর আলাউদ্দীনকে

উস্কাইয়া দিতে হইবে না।—মাত্র কথাটা বিশ্লেষণ করিয়া দিলেই হইল! ম্লেচ্ছের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে বলিয়া, হিন্দুর গৌরবের উপর পদাঘাত করিয়াছে বলিয়া, নারীর মর্য্যাদার ও ধর্ম্মের মুণ্ডপাত করিয়াছে বলিয়া পদ্মিনী কমলাকে যে তিরস্কারটা করিয়াছে ও ধিক্কার দিয়াছে, সে তিরস্কার ও ধিক্কারগুলি অসহিষ্ণু আলাউদ্দীনের পক্ষে নীরবে হজম করা যে একান্তই অসম্ভব হইয়া পড়িবে—তাহা সুচতুর করণ-রায় বেশ বুঝিতে পারিলেন।

করণ-রায় অবিলম্বেই পত্রখানির একখানি ফারসী তর্জ্জমা তৈয়ারী করিলেন। তর্জ্জমা করিলে, পত্রখানি যেরূপ দাঁড়াইল, তাহা এই :—

"ভগ্নি,

শুনিলাম তুমি সম্প্রতি দিল্লীশ্বরী হইয়াছ—বেগম সাজিয়াছ। অতি চমৎকার কথা! তোমাকে ভগ্নী বলিয়া ডাকিতেও আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছে—হিন্দু রমণীর এ সৌভাগ্য নূতন বটে!

গুর্জ্জরের রাজপ্রাসাদে গুর্জ্জরেশ্বরের কোন্ সামগ্রীর অভাব হইয়াছিল জানি না, কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্ম এবং পাঠানের রুদ্র সৌন্দর্য্যই যদি তোমার প্রলোভনের সামগ্রী হইয়া

থাকে—তবে তোমার চিত্তটীকে হিন্দুর ঘরে পাঠাইয়া জগদীশ্বর একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছিলেন—তাহা বলিতে বাধ্য হইব। হিন্দুরমণীর পক্ষে এমন কামনা নিতান্তই বিচিত্র!

ভগ্নি, তুমি কি জান না, হিন্দু-রমণীর একবার ভিন্ন দ্বিতীয় বার পরিণয় নাই, এক ভিন্ন তাহাদের দ্বিতীয় সাধনার পাত্র নাই, এক ভিন্ন তাহাদের দ্বিতীয় ধর্ম্ম নাই। তবে কেন এ কার্য্য করিলে?

কিন্তু যাক্—প্রলোভন তোমার বিবেককে বশীভূত করিয়াছে, সে চিন্তা তোমার হৃদয়ে স্থান পাইবে কেন? কিন্তু এ তুচ্ছ প্রলোভনে তোমার মন মুগ্ধ হইল—এটাই আশ্চর্য্যের বিষয়! যে হতভাগ্য এতদিন তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া পূজা করিয়াছে, সর্ব্বস্ব দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছে, যাঁহার প্রসাদে তুমি সন্তানবতী—তাঁহার সঙ্গ, তাঁহার সেবা, তাঁহার পূজাই যে তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রলোভনের সামগ্রী হইল না—এটা ভাবিয়াই আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। ম্লেচ্ছের সংস্রব একদিন তোমাদিগকে নরকের পথে টানিয়া লইয়া যাইবে,এ আশঙ্কা আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার উপর বাঁদী মতিয়ার যে এতটা প্রভাব তাহা জানিতাম না।

ভগ্নি, শুনিয়াছি, তোমার একটী কন্যা সন্তান আছে ; একবার সেই কন্যার পানে চাহিও, আর ভাবিও, ও মুখে যাঁহার ছবি অঙ্কিত আছে, একদিন তাঁহার সহিত তোমার কি সম্পর্ক ছিল ? ও মুখ যাঁহার প্রসাদে দেখিয়াছ, তাঁহার নিকটে তুমি কত ঋণী ! বিলাসের প্রলোভনে প্রাণাপেক্ষাও অমূল্য মূল্য দিয়া যে কলুষিত কোমল শয্যা ও রত্নসিংহাসন ক্রয় করিয়াছ, উহাদের উপর বসিয়া একবার ভাবিও, যিনি তোমায় রাজসম্পদে, গৌরবে ও মর্য্যাদায় একদিন নিজের সমকক্ষ করিতেও কুণ্ঠিত হন্ নাই, তিনি এখন কোথায় ?

ভগ্নি, তোমায় আর কি লিখিব ? তুমি হিন্দুস্থানের গৌরব-মুকুটে যে কালিমা লিপ্ত করিয়াছ, তাহা কতকালের সাধনায় পুনঃ লুপ্ত হইবে জানি না। আরও সর্ব্বনাশের কথা এই যে, যে তুমি এই কার্য্য করিয়াছ, সে তুমি একজন যে সে কেহ নহ—স্বয়ং গুর্জ্জরেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহস্র সহস্র লোকের বন্দনীয়া নারী—যাঁহার দিকে চাহিয়া লোকে নীতিশিক্ষার দাবী রাখে ! তুমি কি জগতকে আজ এই শিক্ষা দিলে ? তোমার এ আদর্শে ভারতে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, ভগ্নি, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, যদি শীঘ্র প্রায়শ্চিত্ত না হয়, উহা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হিন্দুকে

ঘরে ঘরে আক্রমণ করিবে, দাবানলের ন্যায় সমাজকে, ধর্ম্মকে পোড়াইয়া মারিবে, শত পুণ্যের আদর্শেও পরে আর যাহা ছিল, তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না।

ভগ্নি, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

ভারতের শত-সহস্র রমণী ব্যথিত নয়নে আজ তোমারই পানে চাহিয়া আছে; তাহাদের প্রতীক্ষাকে ব্যর্থ করিও না; শেষ কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হইও না। নিশ্চয় জানিও যদি তুমি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না কর, তবে তাহারা এ ভার গ্রহণ করিবে! পাপিষ্ঠার মত বসিয়া বসিয়া কি তুমি তবে তাহাই দেখিবে? ভীমসিংহ-বনিতা—পদ্মিনী”

* * * * * *

সে দিন রাত্রিতে আলাউদ্দীন যখন বিশ্রামার্থ কমলার শয়ন-কক্ষে গমন করিলেন, তখন বেগম কহিলেন, “জাহাপনা চতুর্দ্দিকে এমন যুদ্ধের সাজ-সজ্জা কেন?”

বাদশাহ বলিলেন, “কমলা, আমি চিতোরে যাব। কত বড় অভি মানিনী এই পদ্মিনী—নিতান্তই আমায় দেখ্‌তেহবে।”

বলিয়া বাদশাহ করণরায়ের তর্জ্জমা করা পত্রখানি কমলাকে পড়িয়া শুনাইলেন। শুনিয়া কমলার চক্ষুও ঈষৎ জ্বলিয়া উঠিল।

আলাউদ্দীন কহিলেন, "এই পদ্মিনীকে আনিয়া তোমার বাঁদী করিতে পারি ত, আমার নাম আলাউদ্দীন খিলিজি! আমি কালই চিতোর যাত্রা করিব। পদ্মিনীর গর্ব্বটা আমার খর্ব্ব করা চাই-ই।"

কমলাও দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "হাঁ জাঁহাপনা, চাই-ই! এতখানি দর্প একটা তুচ্ছ পার্ব্বত্য নারীর—এ অসহ্য!"

শুনিয়া বাদশাহ সন্তুষ্ট হইলেন।

পর দিন ঘুম হইতে উঠিয়াই পথে বাহির হইয়া জ্যোতিষি-রূপী করণ-রায় দেখিলেন,—সৈন্যদের অস্ত্রের ঝণ-ঝণায় ঢি ঢি পড়িয়া গিয়াছে! রাস্তায় রাস্তায় ফৌজেরা কাওয়াত করিতেছে, পল্টনে পল্টনে অস্ত্র-শস্ত্রের আমদানী হইতেছে, সেনাপতিরা যে যার দলবল লইয়া প্রস্তুত হইতেছেন। চারিদিকেই সমরসজ্জার হৈ চৈ! অপরাহ্ণেই বাদশাহ চিতোরাভিমুখে সসৈন্যে রওয়ানা হইবেন, সকলের মুখেই সেই কথা!

ঘরে ফিরিয়া করণরায় পত্রবাহক রাজপুতকে হাসিমুখে কহিলেন, "ধরমসিংহ, পটল তোল! অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। বাদশাহ চিতোরে যাইতেছেন। আমরাও কাল কাবুলের দিকে রওয়ানা হইব।"

ধরমসিংহ কহিল,—"সে কি ? কাবুলে কোথায় ? সে যে অনেকদূর !"

করণরায় কহিলেন,—"ঠিক কাবুলে নয়, কাবুলের রাস্তায় মোগল সেনাপতি তুর্কী খাঁর কাছে ! তুর্কী খাঁই এখন একমাত্র ভরসা !"

HOOGHLY SCHOOL

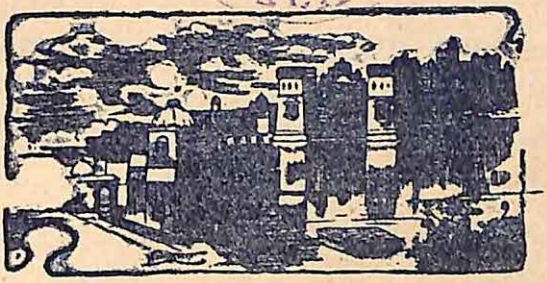

পদ্মিনী

তৃতীয় খণ্ড

বর্ষণ—আরম্ভ

(১)

দেখিতে দেখিতে চিতোরে আহেরিয়ার দিন আসিয়া পড়িয়াছে। আহেরিয়া চিতোরীদের একটী প্রধান উৎসব—চিতোরীরা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

আহেরিয়ার প্রধান অঙ্গ—শিকার! সেই দিনকার শিকারের ফলাফলের উপর চিতোরীরা নূতন বৎসরের

ফলাফল ন্যস্ত করে। সে দিন শিকার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়তো তাহারা মনে করে নূতন বৎসরটী শুভ যাইবে, সেই দিন শিকারে কোন বিঘ্ন ঘটে তো, তাহাদের দুর্ভাবনার সীমা থাকে না। এবার মুসলমানের সহিত সংঘাতের সম্ভাবনা—এবার চিতোরীরা আহেরিয়াকে সফল করিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভাতের অরুণরাগ আরাবল্লীর শীর্ষদেশ রঞ্জিত করিতে না করিতেই সেদিন অশ্বারোহী রাজপুত-শিকারীদের দল কাতারে কাতারে আসিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া পথে দাঁড়াইল। তাহাদের কাহারও হাতে বল্লম, কাহারও হাতে বর্ষা কাহারও হাতে তরবারী উন্মুক্ত। অস্ত্রগুলি উষার স্নিগ্ধ ম্লান জ্যোতিতে বেশ মৃদু-মধুর হাসিয়া উঠিল।

দুর্গ হইতে বাহির হইয়াই মহারাণা কহিলেন, "ভাই সব, এবার আমাদিগকে অতি কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। দিল্লীর সহিত বিরোধ উপস্থিত—এবার প্রাণান্তেও আহেরিয়াকে নিষ্ফল করিও না। আহেরিয়া মেবারের অদৃষ্টলিপি! আজ এই লিপিকে যত পার উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত কর—একটী শিকারও যেন হস্ত-চ্যুত না হয়!"

সৈন্যগণ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—"জয় মহারাণা কি জয়!" তারপর তালে তালে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের পদভরে আরাবল্লীর সে কঠিন উপত্যকাও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

দলের সর্ব্বাগ্রেই রাণা ভীমসিংহ, তাঁহার পশ্চাতে রাজকুমারগণ এবং তৎপশ্চাতে মেবারের সর্দ্দারগণ চলিয়াছেন; সর্ব্বশেষে মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ অশ্বচালনার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সম্মুখে অবনতশিরে একটী বালক আসিয়া দাঁড়াইল।

বালকের উজ্জ্বল ললাট, উন্নত দেহ-রত্ন ও প্রফুল্ল বদনমণ্ডল মহারাণার তেজোদীপ্ত মুখখানির উপরেও আর একটা নূতন আভা ছড়াইয়া দিল। হাস্যোজ্জ্বলমুখে রাণা কহিলেন, "বাদল, একি! কি নিবেদন তোমার?"

বাদল রাজ্ঞী পদ্মিনীর ভ্রাতুষ্পুত্র। বাদল উত্তর করিলেন, "মহারাণা, এবার তো আমার দ্বাদশবৎসর পূর্ণ হইয়াছে—এবার আমার আহেরিয়ায় যাইতে আপত্তি কি?"

মহারাণা আবার হাসিলেন। কহিলেন, "অভিমন্যু, এত ব্যস্ত কেন? কুরুক্ষেত্র সমর আসিতেছে—আর একটু অপেক্ষা কর—সাধ পূর্ণ হইবে! আহেরিয়া তো সিংহলীদের

উৎসব নয়—এ রাজপুতের খেলা! আজ তোমার আহেরিয়ায় যাইয়া দরকার নাই; আজিকার মত আমি তোমাকে চিতোরের অধিপতি করিয়া গেলাম; আমাদের অনুপস্থিতিতে চিতোর তুমি রক্ষা কর।"

বালকের উজ্জ্বল মুখখানি আরও দীপ্তিময় হইয়া উঠিল। রাণা মুহূর্ত্ত কাল এক দৃষ্টে সেই সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

বালক হাসিয়া কহিল—"যে আজ্ঞা"; তারপর অশ্বের মুখ পুনঃ দুর্গের দিকে ফিরাইয়া আবার অশ্বারোহণ করিল।

আরাবল্লীর শীর্ষদেশ ভেদ করিয়া সেই মুহূর্ত্তে উষার নবকিরণজাল তাহার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল!

বসন্তের আবির্ভাবে মেবারের প্রাভাতিক সৌন্দর্য্য কি নির্ম্মল! চারিদিকে অতি অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তরুর শিরে, নির্ঝরিণীর বক্ষে, পুষ্পের সৌন্দর্য্যে কনক রবির আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে, গলিত তুষার-দ্রবের সঙ্গে মিশিয়া আরও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। পাখীর গান, উৎসের তান এক সঙ্গে এক সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে।

রাজপুতেরা প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব স্বচ্ছলতার ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলেন। উৎসাহে আনন্দে তাঁহাদের বক্ষ

স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহারা উল্লাসে গান ধরিল। গানের সুর, উষার কিরণ, প্রকৃতির বিচিত্রতা ও সৈন্যদিগের উৎসাহ-আনন্দ কেমন এক সুরে মিশিয়া গেল! অশ্বপৃষ্ঠে নবীন যোদ্ধারা তালে তালে রেকাবিতে পা ঠুকিতে লাগিল।

মেবারের দ্বাদশজন রাজকুমারের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অরুণ সিংহের হৃদয়টী বড়ই কবিত্বপূর্ণ! 'কুচকুচে' কাল একটী ঘোড়ায় চড়িয়া কুমারদের সকলের অগ্রে তালে তালে ঝুলিতে ঝুলিতে তিনি যাইতেছিলেন; তিনিও গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিলেন। তাঁহার কটিবন্ধের তরবারি নাচিতে নাচিতে নূপুরধ্বনি করিতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু দু'টী চারিদিকের সৌন্দর্য্যে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল।

চিতোরের কয়েক ক্রোশ দূরে সুপ্রসিদ্ধ গিরণার উপত্যকা। সমস্তটা মরুপ্রদেশের ভিতরে এই স্থানটী আজও রাজস্থানের কাশ্মীর বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সেই চারু দেশে ভীলদের আবাসের সন্নিকটে এক বৃহৎ অরণ্য। দলে দলে হরিণ, পালে পালে বরাহ এই অরণ্যে বাস করে। ভীলেরা রাত্রিদিন এই জানোয়ারদের রক্ষা করে; কেবলমাত্র বৎসরের ভিতরে একদিন আহেরিয়া উপলক্ষে রাজপুতেরা আসিয়া

এই বনটী উলট-পালট করিয়া দিয়া যায়। সেদিন বনের কোথাও একটী বরাহ থাকিতে রাজপুতেরা শিকার বন্ধ করে না। আজ সেই আহেরিয়া! রাজপুতেরা সেই উপত্যকার দিকে চলিয়াছে। দূর হইতে অরুণসিংহ দেখিলেন, কি সুন্দর সে দেশ!

তখন উদয়সাগর বা উহার তীরে কমলমীরের প্রাসাদ নির্ম্মিত হয় নাই। স্বভাবের নগ্ন শোভা তখন কৃত্রিমতার আড়ালে লুকাইবার স্থান না পাইয়া পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে শোভার ক্রোড়ে একটা জীবন্ত নীরবতা, পাখীর ডাক, নির্ঝরের 'কুল-কুল' এবং রাজপুতবাহিনীর সেই কোলাহলকেও তুচ্ছ করিয়া দিয়া কেমন একাধিপত্য করিতেছে!

পথ অতিবাহন করিতে করিতে অরুণসিংহ দেখিলেন, —কি সুন্দর মেঘের মত আকাশের গায় ঐ পাহাড়! কি সুন্দর উহার নীচে ঐ স্বচ্ছবারিপূর্ণ অপূর্ব্ব হ্রদ! দূরে অরণ্যানীর পাদমূলে ক্ষুদ্র একখানি কুটীর কি সুন্দর! কিন্তু পথের ধারে জনার ক্ষেতের হরিৎ শোভার উপরে বাঁশের একখানি মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া ওকি? পুতুলা? না— নড়িতেছে বটে!—একটা মেয়ে! কি সুন্দর!

অরুণসিংহ একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে, মঞ্চ নিকটে আসিল। একটা বুনো মেয়ে মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া জনার ক্ষেতের উপর পাহাড়া দিতেছিল! অরুণসিংহ ক্ষুব্ধ হইলেন, ওই সুন্দর বনদেবতার মত অপূর্ব্ব মূর্ত্তিখানির উপরে ওই অসভ্যের পোষাকখানি কি কুৎসিত! অমন সুগঠিত বলিষ্ঠদেহ, অথচ কমনীয় রমণীমূর্ত্তি তিনি কি আর কোথাও দেখিয়াছেন? রাজপুতবাহিনী মঞ্চ ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া গেল। কিন্তু অরুণসিংহ ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া তখনও সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ সৈন্যদের কোলাহলে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল।

অরুণসিংহ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহারা গন্তব্য স্থানে পৌছিয়াছেন। এই সেই বৃহৎ অরণ্যানী! অবিলম্বেই অহেরিয়ার ভীষণ উৎসব আরম্ভ হইবে। রাজপুতেরা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

রাণা লক্ষ্মণসিংহ কহিলেন,—"তোমরা সকলেই সতর্কতার সহিত এই বনপ্রদেশ ঘিরিয়া থাক। আমি ও পিতৃব্য ভীমসিংহ বরাহগুলি তাড়াইয়া লইয়া আসিব। সাবধান! একটী শিকারও যেন হাত-ছাড়া না হয়। মেবারের অদৃষ্ট আজ তোমাদের হাতে!"

বলিয়াই রাণা, ভীমসিংহকে সহ সেই বনপ্রদেশে প্রবেশ করিলেন। রাজপুতেরা বনের চারিদিক্ ঘেরিয়া ফেলিতে লাগিল। অরুণসিংহ কহিলেন, "তোমরা অন্যদিকে যাও— এ স্থান আমার উত্তম পরিচিত, আমি এই পথই রক্ষা করিব।" তিনি সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। অন্যেরা দূরে চলিয়া গেল।

অরুণসিংহ যেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, সেটা বনের প্রান্তদেশ। সেখানে বরাহের গতিবিধি বড় কম। তাঁহার সঙ্গীরা অনতিবিলম্বেই চারিদিকে শিকার আরম্ভ করিয়া দিল; কিন্তু অরুণসিংহের নিকটে একটা বরাহও দেখা দিল না। বল্লমখানি লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে অরুণ-সিংহ সেই মঞ্চখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই বালি-কাও মঞ্চের উপরে তেমনই পুতুলটীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

বাহিরে শিকারের অভাব, অরুণসিংহ ভিতরে ভিতরে এক অপূর্ব্ব আহেরিয়ার উৎসব জাগাইয়া তুলিলেন। বাহিরে বরাহ না পাইয়া তিনি অন্তরের ভিতরে নিজের মনটীকে চিন্তার উপর চিন্তার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। তিনি কত কথাই ভাবিতে লাগিলেন। কে এই বালিকা, এই জনশূন্য প্রদেশে কোথায় তার ঘর?

প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হইয়া গেল, তবু সে গৃহে ফিরিতেছে না কেন? তাহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে কি? আচ্ছা, সেও যদি তাহারই দিকে চাহিয়া চাহিয়া এমনি করিয়া ভাবিত!

অরুণসিংহ কত স্বপ্নই দেখিতে লাগিলেন! ক্রমে দিনমণি পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িল। তখন হঠাৎ বনের এক কোণে আসিয়া একটা বরাহ দেখা দিল। অরুণসিংহ ফিরিতে না ফিরিতে, বুঝিতে না বুঝিতে চকিতে বিদ্যুতের মত সে প্রাণের ভয়ে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল! অরুণসিংহ তাড়াতাড়ি বল্লম তুলিয়া ধরিলেন, কিন্তু তখন বরাহ কোথায়? বহুদূরে, তাঁহার ক্ষমতার অন্তরে! বল্লম মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিয়া অরুণসিংহ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই অদূরে একটা আহত জানোয়ারের কাতর শব্দ শোনা গেল। অরুণসিংহ তাড়াতাড়ি চাহিয়া দেখিলেন, সেই মঞ্চের নিকটে বালিকার অস্ত্রাঘাতে বরাহটা বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে!

অরুণসিংহ আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। অশ্ব ছুটাইয়া তাড়াতাড়ি সেইদিকে যাইবেন, এমন সময়ে আর একটা বরাহ সেইরূপ অন্য দিক্ দিয়া প্রস্থান করিল। এবার

অরুণসিংহ বিব্রত হইলেন। এবার বরাহ যে দিক্ দিয়া পলাইয়াছে, সে দিক্ মঞ্চ হইতে বহুদূরে! অরুণসিংহ ভাবিলেন, এবার আর রক্ষা নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল। তিনি দেখিলেন, এবারও বরাহটা আর একটা বল্লমের আঘাতে আহত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে! বিস্ময়ে অরুণসিংহ পুনঃ সেই বালিকার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, বালিকা খিল খিল করিয়া হাসিতেছে।

তখন অরুণসিংহের আর হিতাহিত জ্ঞান নাই। তিনি তখন কেবল সেই বালিকার কথাই ভাবিতে লাগিলেন, আর মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ নিশ্চয়ই কোন বনদেবী! মানুষের কি এত শক্তি হয়? এমন রূপ কি বনের ভিতরে ফুটে! যা থাকে অদৃষ্টে, একবার ইহাকে মুখোমুখী হইয়া দেখিব! বনদেবী যাহার সহায়, তাহার পার্থিব বিপদে ভয় কি? এখনই বরাহটাকে আনিবার ছলে একবার ইহার নিকটে যাইব।

এই ভাবিয়া অরুণসিংহ আবার অশ্বের মুখ ফিরাইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু একবারে নিকটে না পৌঁছিতেই পশ্চাতে আর একটা বরাহের পলায়নশব্দ

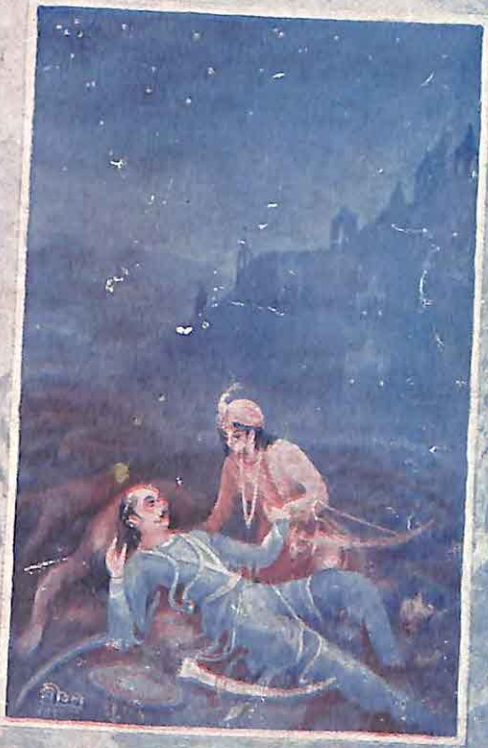

শুনিতে পাইলেন। কিন্তু এবার শুধু সে শব্দ নহে; সঙ্গে সঙ্গে অশ্বের দ্রুতপদবিক্ষেপ-শব্দ ও রাণার কণ্ঠধ্বনিও শ্রুত হইল! চমকিত হইয়া অরুণসিংহ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। রাণাকে বরাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া অরুণসিংহ প্রমাদ গণিলেন। কি সর্ব্বনাশ! বরাহটা এবার সত্য সত্যই পলাইয়া গিয়াছে! বালিকা এবার সেই মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া একটী অঙ্গুলিও নাড়ে নাই, একবারেই স্তব্ধ হইয়া আছে; তিনিও স্থান ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছেন!

অরুণসিংহ দেখিলেন, রাণা ক্ষিপ্তের মত বরাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া গেলেন। বরাহ তখন বন ছাড়িয়া অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি রাণা ক্ষান্ত হইতেছেন না, মরিয়া হইয়া কেবলি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন। তখন অরুণসিংহও ঘোড়া ছুটাইয়া সেইদিকে চলিলেন। একটা ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয়টী 'দূর-দূর' করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কতক দূর যাইয়াই অরুণসিংহ দেখিলেন, বরাহটা অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন রাণা অশ্ব হইতে নামিয়া মস্তক হইতে উষ্ণীষ ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।

ঘোড়াটা নিকটে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল। অরুণসিংহ প্রমাদ গণিলেন।

এমন সময় বনের চারিধার হইতে লোক-জনেরা ছুটিয়া আসিয়া অরুণসিংহকে জিজ্ঞাসা করিল—"রাণা কোথায়?"

অরুণসিংহ আর কথা কহিতে পারেন না! ক্ষোভে, দুঃখে ও আশঙ্কায় তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাণাকে দেখাইয়া দিলেন। তার পর সকলে সেই দিকে অগ্রসর হইলে নিজেও একটু একটু করিয়া সেই দিকে যাইতে লাগিলেন।

সঙ্গিগণকে দেখিয়া রাণা গর্জ্জিয়া কহিলেন, "হতভাগাটা সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আজ আমি বরাহের পরিবর্ত্তে তাহাকেই সংহার করিব।"

রাণা ভীমসিংহ নিমিষের মধ্যেই ব্যাপারটা বুঝিয়া রাণাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "অরুণ ছেলে মানুষ, তাহার উপর রাগ করিয়া কি হইবে? যা হ'বার হইয়াছে, এখন ইহার কি প্রতীকার হইতে পারে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। এস বরাহের পরিবর্ত্তে আমরা আজ বুকের রক্তদিয়া চিতোরেশ্বরীর পূজা করি। দেবী নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন, নিশ্চয়ই চিতোরের মঙ্গল হইবে।"

কিন্তু রাণাকে তখন সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। রাণা অরুণসিংহকে দেখিয়াই ত্বরিতে লাফাইয়া উঠিলেন, অশ্বারোহণ করিয়া তখনই তাঁহার দিকে ছুটিয়া যাইবেন, এমন সময় ভীমসিংহ হঠাৎ ধরিয়া ফেলিলেন।

সেই সময় দূরে খুব দ্রুতগামী একটা অশ্বের পদধ্বনি শোনা গেল। চিতোরের দিক্ হইতে কেহ ঊর্দ্ধশ্বাসে অশ্ব ছুটাইয়া তাঁহাদিগের দিকে আসিতেছে, এইরূপই অনুভূত হইল। সকলেই বিস্মিত হইয়া সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। একটী ক্ষুদ্র অশ্বারোহী তাঁহাদের দিকে দেখিতে দেখিতে ছুটিয়া আসিল। অশ্বারোহী নিকটে আসিলে সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাহার পশ্চাতে রাণার তাড়িত সেই দুর্দ্দান্ত বরাহটার মৃত দেহটী ঝুলিয়া রহিয়াছে, আর সেই অশ্বারোহী—বাদল!

রাণা সবিস্ময়ে কহিলেন, "একি! বাদল, তুমি এখানে কোথা হইতে?"

বাদল কহিল, "রাণা, আমি অতি জরুরী সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আলাউদ্দীন মেবারে প্রবেশ করিয়াছে। গুপ্তচর তাহাকে শঙ্কর দেঁওর মন্দির আক্রমণ করিতে দেখিয়া আসিয়াছে। ত্বরায় দুর্গদ্বার বন্ধ করা আবশ্যক।"

একটা আকস্মিক উত্তেজনা ও বিস্ময়ের ঢেউ সেই রাজপুত যোদ্ধাদের উপর দিয়া হঠাৎ বহিয়া গেল। সকলেরই কোষে তরবারি ঝন্ ঝন্ রবে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

রাণা ভীমসিংহকে কহিলেন, "কাকাজী, আহেরিয়ার ফল হাতে-হাতেই ফলিল, দেখিতেছি প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবসরটুকুও দিল না। এখন কি করা কর্ত্তব্য ?"

তারপর হঠাৎ বাদলের দিকে চাহিয়া পুনঃ উত্তেজিত ভাবে কহিলেন, "বালক, একি! তোমার পশ্চাতে ও বরাহের মৃতদেহটা কোথা হইতে আসিল। ও যে আমারই তাড়িত বরাহের মৃতদেহ! আমি উহার পশ্চাদ্দেশ একটু বিদ্ধ করিয়াছিলাম, ক্ষতটী এখনও তদ্রূপই রহিয়াছে! বুঝি চিতোরের ভাগ্যলক্ষ্মী এখনও আমাদিগকে একবারে ছাড়িয়া যান নাই,—চল, শীঘ্র চল! কিন্তু তদ্‌পূর্ব্বে বল—কেমন করিয়া তুমি ইহাকে লাভ করিলে।"

বাদল কহিল, "মহারাণা, পথে আসিতে আসিতে দেখিলাম, একটা বরাহ প্রাণের দায়ে ছুটিয়া যাইতেছে। দেখিয়াই বুঝিলাম, এ আহেরিয়ার পলাতক—অমনিই বর্ষাঘাতে বিদ্ধ করিলাম। তারপর মহারাণাকে উপহার দিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠে করিয়া এইখানে লইয়া আসিয়াছি।"

মহারাণা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া বাদলকে হাতে ধরিয়া নীচে নামাইলেন, তারপর তাহাকে খুব গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। কহিলেন, "সিংহলী বীর, আজ যে তুমি আহেরিয়াকেই মাত্র সফল করিয়াছ তাহা নহে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, এবার তোমা হইতেই চিতোর রক্ষিত হইবে। আজ এই যুদ্ধে তোমাকেই আমি চিতোরের সেনাপতি করিলাম।" তারপর ফিরিয়া অরুণসিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অরুণ সিংহ, আজ হইতে তুমি নির্ব্বাসিত! যে রাজপুত রাণার পুত্র হইয়াও কর্ত্তব্য ভুলিয়া বন্য-বালিকার রূপে আকৃষ্ট হয়, চিতোরে তাহার বিন্দুমাত্র স্থান নাই। আজ হইতে চিতোরে প্রবেশ করিলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।"

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল। ভীমসিংহ প্রমাদ গণিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া রাণাকে কহিলেন, "রাণা, এ বিপদের দিনে চিতোরকে দুর্ব্বল করিও না—অরুণসিংহ বালক মাত্র!"

লক্ষ্মণসিংহ উত্তেজিত ভাবে কহিলেন, "কাকাজী. রাজপুত্র বলিয়া অরুণসিংহের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন? কিন্তু রাজকার্য্যে এমন অনুগ্রহের স্থান নাই। আমি রাণা, রাণার কর্ত্তব্য করিব।"

ভীমসিংহ নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন। অপরাপর সর্দ্দারগণ এবং রাজকুমারেরা অরুণসিংহের পক্ষ হইয়া রাণাকে অনুরোধ করিবেন, মনে করিতেছিলেন; কিন্তু ভীমসিংহের অবস্থা দেখিয়া নিরস্ত হইলেন। হতভাগ্য অরুণসিংহ থামের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া, সেইখানে মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাণা ও সর্দ্দারগণ অগ্রসর হইলে বাদল একটু পেছনে পড়িয়া চুপি চুপি অরুণকে কহিলেন, "কুমার, কি করিয়াছ? এ বিপদের দিনে তোমাকে আমরা হারাইলাম!"

অরুণসিংহ তাঁহার দিকে চাহিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে কহিলেন, "বাদল, তুমি আজ চিতোরকে রক্ষা করিয়াছ, দুঃখ করিও না। আশা করি তুমিই চিতোরকে এ বিপদে রক্ষা করিবে। আমি হতভাগ্য, আমার জন্য আক্ষেপ কেন? আমার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডই হইয়াছে। পিতা ন্যায় বিচারই করিয়াছেন। এ মুখ আমার আর চিতোরে দেখান কর্ত্তব্য নয়। যাও বীর, প্রাণ দিয়া চিতোরকে রক্ষা কর, বিলম্বে বিপদ্ ঘটিতে পারে।"

বাদলের ক্ষুদ্র হৃদয়খানি বেদনায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার তো কিছু করিবার নাই! দুঃখিত মনে বাদল

অশ্ব ছুটাইয়া চলিয়া গেল। সেই সন্ধ্যার আঁধারে, সেই অপমান, দণ্ড, আশঙ্কা, উদ্বেগ, ও অনুতাপের জ্বালা-যন্ত্রণাগুলি লইয়া অরুণসিংহ সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক মুহূর্ত্তে বিশ্বসংসার যেন তাঁহার নিকটে শূন্যহইয়া গেল।

অরুণসিংহ কতক্ষণ যে এইভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার ঠিক নাই। যখন চৈতন্য হইল, তখন দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁহারই দিকে মুখ করিয়া সেই বুনোদের মেয়েটা দাঁড়াইয়া আছে!

এতক্ষণ এই গোলযোগে অরুণসিংহ এই আশ্চর্য্য মেয়েটার কথা একবারও ভাবেন নাই। এখন তাহাকে দেখিয়া আবার কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন।

বালিকা একদৃষ্টে তাঁহারই দিকে চাহিয়াছিল। তাঁহাকে মাথা তুলিতে দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবে? যাহা হইবার তো হইল।"

অরুণসিংহ আশ্চর্য্য হইলেন। সে তবে সকলই শুনিয়াছে? তাঁহার খোঁজ লইবার জন্য, তাঁহার কথা জানিবার জন্য মেয়েটা যে এতদূর কষ্ট করিয়া আসিয়াছে, একথা মনে করিতেও তাঁহার একটু আনন্দ হইল!

অরুণসিংহ কহিলেন, "দেখিতেছি, তুমি নিজের পরিচয়

না দিয়াই, আমার পরিচয়টী অবাধে সংগ্রহ করিয়াছ ! তুমি ওস্তাদ চোর বটে ! এ বনে কি কোন আশ্রয়স্থানই নাই ?"

বালিকা হাসিয়া কহিল,"আছে, কিন্তু সে বাঘ-ভাল্লুকের উদরে ! সেখানে আশ্রয় লইতে বোধ হয় তেমন আগ্রহ হইবে না ? আমাদের বাড়ীতে যাইবে ?"

অরুণসিংহ অবাক্ হইয়া বালিকার মুখপানে চাহিল। এ শুধু প্রগল্‌ভতা নয় ! এই নিঃসঙ্কোচ বাক্‌চাতুর্য্যের নীচে একটা অতি সরল হৃদয়ের মধুর পবিত্রতাও উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের বাড়ী কতদূর ?"

বালিকা কহিল, "ঐ একখানি ছোট পাহাড় দেখিতেছ ? উহার পরে আর একখানি পাহাড়, তার পরেই আমাদের বাড়ী। আমার বাবা কৃষক, কিন্তু জাতিতে আমরা রাজপুত ! আমার মা তোমাকে দেখিলে নিশ্চয়ই খুব সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু একটা মুস্কিল দেখিতেছি ; তুমি রাজার ছেলে ?"

অরুণসিংহ কহিলেন, "তাতে কি ? রাজার ছেলেকে কি তোমাদের আশ্রয় দিতে নাই ?"

বালিকা কহিল, "তা কেন ? কিন্তু গরীবের ঘরে তোমাদের কি সেরূপ আদর-যত্ন হইবে ?"

অরুণ-সিংহ হাসিয়া কহিলেন, "সে জন্য চিন্তা নাই। যে বাঘ-ভাল্লুকের উদরে যাইতে বসিয়াছে, তাহার অযত্নে ভয় কি? কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবিতেছি। লোকালয়ে আমি আর এ মুখ দেখাইতে পারিব না। যতদিন না এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, ততদিন আমাকে বনে-বনেই ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে!"

বালিকার মুখে একটা সহানুভূতির ম্লান আলোক জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, "পাগল। বনে বনে ঘুরিয়া ফিরিয়া কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবে? তার চেয়ে যে লোকালয়ে ঢের সুবিধা।"

অরুণসিংহ বিস্মিত ভাবে বালিকার মুখের দিকে চাহিলেন। কহিলেন, "লোকালয়ে আর সুবিধা কি? কে আর আমায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে? কে আর আমায় উৎসাহ-উদ্যম দিবে? বৃথা কেন যাচিয়া অপমানের বোঝা মাথায় করিব?"

বালিকা কহিল, 'শুন, তুমি রাজার পুত্র—বীরপুরুষ! বিধির বিড়ম্বনায় একটা ত্রুটী করিয়া ফেলিয়াছ, এ জন্য নিরুৎসাহ হইও না। আবার একটা সুকর্ম্ম করিলেই হয়ত এ কলঙ্ক ধুইয়া যাইবে। আবার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া

আসিবে! এইতো পাঠানের সঙ্গে লড়াই উপস্থিত! এ সুযোগে একটা কিছু কর না?"

অরুণসিংহ বিস্মিত ভাবে বালিকার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এ তো ঠিক বালিকার মত কথা কহিতেছে না? সত্যই তো এ এক অপূর্ব্ব সুযোগ! অরুণসিংহ কি এ সুযোগে আপন কলঙ্ক স্খালন করিতে পারেন না? কেন পারিবেন না? কিন্তু হায়! তিনি যে আজ একা!

অরুণসিংহের সমস্তটা উজ্জ্বল মুখ একটা কাল ছায়ার সম্পাতে অন্ধকার হইয়া গেল। বালিকা তাঁহার হৃদয় বুঝিল। কহিল, "তুমি আপনাকে নিঃসহায় ভাবিতেছ? এ নিতান্ত দুর্ব্বলতা! আত্মনির্ভরতা না থাকিলে পুরুষের কোন কার্য্যই হয় না। তুমি আমার সঙ্গে এস, এ বনের সকল ভীলজাতিই আমাদের বন্ধু। তাহাদের সহায়তা আমি তোমাকে উপহার দিব। তাহাদের সাহায্যে নিশ্চয়ই তুমি দেশের কাজ করিতে পারিবে।"

অরুণসিংহের হৃদয়ের ভিতর কে যেন একখানি আশার প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। কি একটা অজানিত প্রলোভন যেন ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাকে বালিকার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে-

ছিল। এতক্ষণ তিনি তাহার বিরুদ্ধে বহুকষ্টে যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু আর পারিলেন না! গদ্‌গদ কণ্ঠে অরুণসিংহ কহিলেন, "কৃষক-বালিকা, তোমার নাম কি?"

বালিকা হাসিয়া কহিল, "আমার নাম ময়না,—মা-বাপ আমাকে আদর করিয়া মুন্না বলিয়াই ডাকে! আমাকে এই নামেই ডাকিও।"

অরুণসিংহ কহিলেন,—"তুমি শুধু বরাহ শিকারে সিদ্ধহস্ত নও, মানুষ শিকারেও তোমার হাত আছে দেখিতেছি। অরুণসিংহকে আর কেউ বাধ্য করিতে পারিত কিনা সন্দেহ! কিন্তু তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না। চল, তোমার ঘরেই আশ্রয় লইব, চল।"

মুন্না তখন পথ দেখাইয়া অরুণসিংহকে সেই প্রান্তরের ভিতর দিয়া গৃহাভিমুখে লইয়া চলিল। নির্ব্বাসনের কষ্ট তখন অরুণসিংহের হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে!

(২)

দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহারাণা আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন! বাদলকে ডাকিয়া কহিলেন—"আজ হইতে তুমি চিতোরের সেনাপতি হইলে, অতি সাবধানে মুসলমানের হাত হইতে দুর্গ রক্ষা কর, দেখিও যেন সিংহলের মর্য্যাদা

খর্ব্ব করিও না। আবশ্যক বোধ হইলে পিতৃব্য ভীমসিংহের নিকট হইতে সাহায্য চাহিও।" তারপর মহারাণা সৈন্য-সামন্তদিগকে ডাকিয়া বাদলকে সেনাপতির মত মান্য করিবার জন্য সকলকে ভালরূপ কহিয়া দিলেন।

মহারাণার নিকট হইতে বিদায় হইয়া বাদল আসিয়া পদ্মিনীর পিতৃব্য গোরার আলয়ে দেখা দিলেন।

গোরা তখন একখানি খাটিয়ার উপর বসিয়া আপনার অর্দ্ধশ্বেত গুম্ফে উত্তমরূপে চাড়া দিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে কি ভাবিতেছিলেন; বাদলকে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "কি সৌভাগ্য আজ! সেনাপতি মহাশয় যে সশরীরে গরীবের আলয়ে উপস্থিত! খবর ভাল তো?"

বাদল কহিলেন, "ঠাকুর্দ্দা, সেনাপতি কে? সেনাপতি আমি না তুমি? আমি তোমার ভরসায়ই এ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি, এখন পশ্চাৎ রক্ষা কর।"

গোরা আপনার সুবিশাল বাহুদ্বয় দিয়া বাদলের কণ্ঠদেশ খুব আচ্ছা করিয়া মাটীর দিকে চাপিয়া কহিলেন, "সর্ব্বনাশ! এখন বুড়ো-থুড়ো হইয়াছি, এখন কি আমাদের সে সময়? এখন আমরা কেবল আরাম করিয়া খাটিয়ায় পড়িয়া সিদ্ধি-

বাটা খাইব, আর পৌত্রপৌত্রীদের লড়াই-খেলা দেখিব। ও সব বাজে কাজ এখন তোমরা কর, আমরা একটু তামাসা দেখি।"

গোরার হাতের চাপে বাদলের স্কন্ধটা মাটীর দিকে বেশ নামিয়া যাইতেছিল, বাদল কহিলেন, "দাদা, দাদা, ওকি ? ওকি করিতেছ ? এইখানেই দেখিতেছি, তুমি সেনাপতির দফা রফা করিয়া দিবে! আমার ঘাড়টা যে ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইয়াছে!"

গোরা কহিলেন, "এত বড় দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়াছ, ঘাড়ের অত মায়া কেন ? যাহা হউক, তোমার মধ্যে সেনাপতির যোগ্যতা আছে, বোধ হইতেছে। আমার এ দু'টো হাতের চাপ স্বয়ং রাণা ভীমসিংহও সহ্য করিতে পারেন না, তুমি বেশ সহিয়া যাইতেছ! দেখিতেছি, তুমি চিতোর রক্ষা করিতে পারিবে!"

বাদল হাসিয়া কহিলেন, "দাদা, ও কথায় আমায় ভুলাইতে পারিবে না ; এখন কি কি করিতে হইবে সেই উপদেশ দাও, তোমার বুদ্ধির পশরাটা খোল। আমাকে ফাঁকি দিয়া তাড়াইতে চাহিতেছ, কিন্তু সেইরূপ করিলে দিদিমার নিকটে আমি নালিশ করিব।"

এমন সময় একটী উজ্জ্বলবরণা রূপসী রাজপুতনী সেই-খানে আসিয়া দেখা দিলেন। কহিলেন, "বাদল, কি হইয়াছে ভাই ?"

বাদল কহিলেন, "দিদিমা, দেখতো দাদা মহাশয়ের অন্যায়টা! সিংহলী হইয়া সিংহলীর সম্মান বাঁচাইতে চান না। আজ আমি সেনাপতি হইয়া তাঁহার নিকটে একটু বুদ্ধি-পরামর্শ ধার করিতে আসিয়াছি, তা কি না তিনি এক-বারে রত্নদত্ত হইয়া বসিয়াছেন! তোমাকে ইহার বিচার করিতে হইবে!"

রাজপুতনী হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা ভাই, আমিই ইহার বিচার করিব। তুমি তো সেনাপতি হইয়াছ! তা, সেনাপতির মতই হুকুম চালাও না ? এত অনুরোধ-উপ-রোধের দরকার কি ?"

বাদল হাসিয়া কহিলেন, "ঠাকুর্দ্দা, এইবার কেমন ?"

গোরাও উত্তর করিলেন, "তা—তা—বিচার যখন হইয়াছে, তখন তো আর তোমাকে অমান্য করিতে পারি না। এখন কি করিতে হইবে হুকুম দাও।"

বাদল কহিলেন, "এমন কিছু নয়, আলাউদ্দীন বহু সৈন্য লইয়া চিতোরে আসিতেছে, তাহাকে একটু গলাধাক্কা

দিয়া হাঁকাইয়া দিতে হইবে, আর দেশটাকে অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।"

গোরা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ব্যস্! কথাতেই ব্যাপারটীকে অর্দ্ধেক সরল করিয়া ফেলিয়াছ যে! বাকী অর্দ্ধেকটা কার্য্যে পরিণত করিতে কিন্তু একটু বেগ পাইতে হইবে। আলাউদ্দীন এখন কতদূর অগ্রসর হইয়াছে?"

বাদল কহিলেন, "এখনও ঝিলোরে পৌঁছিতে পারেন নাই। শুনিতেছি, তাঁহার সৈন্যেরা না কি পরিশ্রান্ত হইয়া গিরলের উপত্যকায় বিশ্রাম করিতেছে। চিতোরে আসিতে এখনও দুই দিন লাগিবে!"

গোরা কহিলেন, "এ বিশ্রাম নয় সেনাপতি, এ সুযোগ অন্বেষণ! আলাউদ্দীন এখন চিল-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। এক জায়গায় চুপ করিয়া লুকাইয়া রহিয়াছে, হঠাৎ একদিন ছোঁ মারিয়া মাছ লইয়া পলাইবে। শীঘ্র দুর্গের দরজা বন্ধ কর। আলাউদ্দীনের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে সুবিধা হইবে না।"

বাদল কহিলেন, "সে ব্যবস্থা রাণা ভীমসিংহ ইতি-পূর্ব্বেই করিয়াছেন। তাঁহার আদেশে সৈন্যগণ বড় বড় পাতর, ইট্-পাটকেল প্রভৃতি প্রাচীরের গোড়ে জড় করিতেছে!"

গোরা কহিলেন, "রাণা ভীমসিংহ বিচক্ষণ ব্যক্তি দেখিতেছি; তিনি ইতিপূর্ব্বেই সব বুঝিতে পারিয়াছেন! কিন্তু তোমার প্রতি কিছু অবিচার করা হইয়াছে! তোমাকে এমন সাক্ষী গোপালের মত সেনাপতি করিয়া বিদ্রূপ করা তাঁহাদের সঙ্গত হয় নাই। বোধ হয় তাঁহারা বালক ভাবিয়া তোমার উপরে ততটা নির্ভর করিতে পারেন না। তাঁহাদের এ অবিশ্বাস দূর করিতে হইবে।"

বাদল কহিলেন, "দাদা, এ শুধু আমার উপর অবিশ্বাস নয়, এ ষোল আনা সিংহলীদের উপরই অবিশ্বাস! তাঁহারা জানেন, এ যুদ্ধে আমি সেনাপতি হইলেও তুমিই আমাকে সাহায্য করিবে। তোমার ন্যায় প্রবীণ সেনাপতির উপরে অবিশ্বাস আর সিংহলী যোদ্ধা-মাত্রকেই অবিশ্বাস, সে একই কথা। এ অবিশ্বাস নিতান্তই দূর করা আবশ্যক।"

গোরা কহিলেন, এ বুড় বয়সে একান্তই আবার একটা দায়ীত্ব ঘাড়ে করিতে হইল দেখিতেছি। তা যখন অন্য উপায় নাই, তখন আর কি করিব? কিন্তু কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে একবার পদ্মিনী রাণীকে সংবাদ দেওয়া উচিত। চল, একবার তাঁহার নিকটে যাওয়া যাক্।"

বাদল কহিলেন—"সে কথা ঠিক! কিন্তু তিনি যে এখন রাজকুমার অরুণসিংহের জন্য অস্থির! রাজকুমারকে কি প্রকারে মুক্ত করিবেন, তিনি এখন রাণা ভীমসিংহের সঙ্গে সেই পরামর্শই করিতেছেন, এ সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন হইবে।"

গোরা কহিলেন, "সে জন্য ভাবনা নাই, তুমি আইস। রাজপুতের নিকট পূর্ব্বে চিতোর, পরে আত্মীয়-স্বজন। সেনাপতিকে রাজকার্য্যে উপস্থিত দেখিলে, নিশ্চয়ই তিনি পূর্ব্বে আমাদের কথা শুনিবেন।"

বলিয়া গোরা তখনই বেশভূষা পরিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন। তখন বাদলও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

(৩)

সুপ্ত জগতের উপরে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নিশীথের একটা ঘন-অন্ধকার আবরণ বিস্তৃত হইয়াছে। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, কোথাও এতটুকু সাড়া শব্দ নাই, কেবল দুর্গের প্রাচীরের ঘাটিতে ঘাটিতে বিনিদ্র প্রহরীদিগের পদশব্দ এবং অস্ত্রাদির 'টুন-টান্' একটু একটু শোনা যাইতেছে। দুর্গের ইতস্ততঃ কয়েকটী বাতি তখনও নিবু নিবু করিয়া জ্বলিতেছে,

চারিদিকের অন্ধকার তাহাদিগের অস্তিত্বটাকে বড়ই ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে।

এমন সময়ে পদ্মিনী-প্রাসাদের একটী কক্ষে বাদল ও গোরা দুই জন রাণীর নিকটে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। পদ্মিনী তাঁহাদের কথা শুনিয়া হাসিতেছিলেন, আর বারবার গবাক্ষপথে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। অনেকক্ষণ হইল, ভীমসিংহ মহারাণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন না তো! পদ্মিনী যে ভীমসিংহের অদর্শনেই এতটা কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু অরুণসিংহের সংবাদ জানিবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। হতভাগ্য বালকের দণ্ডমোচনের নিমিত্তই তিনি ভীমসিংহকে অনুরোধ-উপরোধ করিবার জন্য মহারাণার নিকট পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তাহার পর অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, এখনও ভীমসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন না। তবে কি, তাঁহার প্রার্থনা সফল হয় নাই!

পদ্মিনীর হৃদয় এ কথা চিন্তা করিতেও ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সন্তান ছিল না, কুমারদিগকেই তিনি পুত্রবাৎসল্যে পালন করিয়াছেন। সেই কুমারদিগের

মধ্যে আবার অরুণসিংহই তাঁহার সর্ব্বাধিক প্রিয়। সেই হতভাগ্যের কি এই পরিণাম!

পদ্মিনী চঞ্চল হইয়া বারবার গবাক্ষপথে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাঁহার সেই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া গোরা ও বাদল অবশেষে বিদায় গ্রহণ করিলেন। গৃহে যাইবার জন্য তাঁহারা পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সেই সময়ে চিতোরের রাজপথে জনপ্রাণী মাত্র নাই। রাস্তার দুই পার্শ্বে গৃহে গৃহে নাগরিকগণ নিদ্রিত। উপরে তারকাগণ নিস্তব্ধ দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছে। তাহাদের দিকে চাহিতে চাহিতেই দুই জন আস্তে আস্তে পথ অতিবাহিত করিয়া যাইতে লাগিলেন। নিশীথের সে গম্ভীর নিস্তব্ধতায় তাঁহাদের পায়ের লঘু শব্দগুলিও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে চমকিত করিয়া দিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দু' একটা পক্ষী সে শব্দে আতঙ্কিত হইয়া শাখান্তরে গমন করিল।

হঠাৎ অদূরে প্রাচীরের নীচে একটা গোল উঠিল। গোরা বাদলকে টানিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে কাণ ফেলিয়া ভাল করিয়া শুনিয়া উদ্বেগ-পূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "এ মুসলমানের জয়ধ্বনি —প্রাচীরের নীচ

হইতে আসিয়াছে! নিশ্চয় দুর্গ আক্রান্ত হইয়াছে। চল, শীঘ্র চল, কি সর্ব্বনাশ!"

এবার স্পষ্ট "আল্লা হো আকবর" শব্দ তাঁহাদের কর্ণরন্ধ্রে আসিয়া আঘাত করিল। তাঁহারা তখনই দৌড়িয়া প্রাচীরের নিকট গেলেন।

প্রাচীরের নিকটে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দেখিলেন, ইতিপূর্ব্বেই তথায় অনেক লোক-সমাগম হইয়াছে; স্বয়ং ভীমসিংহ তথায় দাঁড়াইয়া নীচে অবিশ্রান্ত প্রস্তরবৃষ্টি করিতেছেন; এবং সেই প্রস্তরের আঘাতে দুর্গনিম্নে কৃষ্ণসাগর তুল্য একটা অস্পষ্ট মানব-সমুদ্র বিক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে; আর সেই ক্ষুব্ধ সাগর হইতেই ঘনঘন ওই "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি উঠিতেছে।"

বাদল ও গোরা এক মুহূর্ত্ত কিং-কর্ত্তব্যবিহীন হইয়া উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। তারপরই দ্রুত গতিতে যাইয়া ভীমসিংহের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন।

ভীমসিংহ তখন একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর স্থানচ্যুত করিবার জন্য প্রাণান্ত করিতেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিলেন না; গোরা যাইয়া এক ধাক্কায় উহা নীচে

ফেলিয়া দিলেন। ভীমসিংহ মস্তক উত্তলোন করিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন।

ভীমসিংহ হাসিয়া কহিলেন, "পিতৃব্য, সেনাপতি কোথায়? এখন যে আর নিদ্রা যাইবার সময় নাই!—শত্রু দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; দুর্গপ্রবেশের চেষ্টা করিতেছে! এই বেলা দুর্গ রক্ষা করিতে হইবে। তাহাকে শীঘ্র সংবাদ দিন।"

গোরা কহিলেন, "রাণা, নিশ্চিন্ত থাকুন, সেনাপতি ইতিপূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছেন, আর তিনি উপযুক্ত সময়েই আসিয়াছেন, প্রস্তর-বৃষ্টিরতো এখনও সময় হয় নাই, আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে; শত্রুকে কতেক পথ পর্ব্বতারোহণ করিতে দিতে হইবে।"

ভীমসিংহ বিস্মিত হইয়া গোরার দিকে চাহিলেন। গোরাকে তিনি উত্তমরূপে জানিতেন, তিনি তখনই প্রস্তর-বর্ষণ স্থগিত রাখিবার হুকুম দিলেন। পর মুহূর্ত্তেই বাদল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রস্তরবৃষ্টি ক্ষান্ত হইল দেখিয়া মুসলমান সৈন্যগণ অবলীলাক্রমে দুর্গারোহণ করিতে লাগিল। ঢালু পর্ব্বত-বক্ষে সহজে চরণ স্থির রাখা যায় না। তাহারা অতি কষ্টে,

অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ পদস্খলন হেতু নীচেও গড়াইয়া পড়িতে লাগিল ; কিন্তু তাহাতে ভীত হইল না। রাজপুতদের প্রস্তরসঞ্চয় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া, তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু অকস্মাৎ একি বিভ্রাট ?

পাঠানেরা প্রায় পর্ব্বতের মাঝামাঝি উঠিয়াছে, এমন সময় গোরার ইঙ্গিত পাইয়া বাদল হুকুম দিলেন, এইবার প্রস্তর ছাড়। তখনই সশব্দে বহুতর বড় বড় প্রস্তর আসিয়া অকস্মাৎ পাঠানদিগের উপরে পতিত হইল, একবারে সহস্র সহস্র পাঠান নীচে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইয়া গেল। যতক্ষণ তাহারা নীচে ছিল, ততক্ষণ এই প্রস্তরবৃষ্টি তাহাদিগকে ততটা কাবু করিতে পারে নাই। কেননা, প্রস্তরগুলি যাহাদিগের উপরে নিপতিত হইত, শুধু তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত। কিন্তু এবার তাহাদিগের আক্রমণ বড় প্রচণ্ড হইল। এবার তাহারা শুধু দু'এক জনকে আহত করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, একবারে গড়াইতে গড়াইতে অসংখ্য পাঠানকে নীচে নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিল। যাহারা আহত হইল তাহারা তো মরিলই, যাহারা সেই আহত ব্যক্তিদিগের

চাপে পড়িল, তাহারাও গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে একের আঘাতে অন্য, অন্যের আঘাতে অপর—এইরূপ করিয়া যে কত পাঠান মরিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ক্রমে পাঠানেরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

ভীমসিংহ এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া আনন্দাতিশয্যে বাদলকে আলিঙ্গন করিলেন। কহিলেন, "চিতোর আজ তোমার নিকটে যথার্থ ঋণী রহিল।"

তারপর এক ছড়া বহুমূল্য হার নিজ কণ্ঠদেশ হইতে খুলিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন।

ততক্ষণে যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে; পাঠানেরা পর্ব্বতারোহণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া দুর্গের নিম্নে প্রান্তরে আশ্রয় লইতেছে; ঊষার উজ্জ্বল নক্ষত্র পূর্ব্বাকাশে ভাসিয়া উঠিয়াছে। ভীমসিংহ সেইস্থান হইতে বিদায় হইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বাদলও তখন ধীরে ধীরে গোরার নিকটে যাইয়া সেই হারটী তাঁহারই গলায় পরাইয়া দিলেন।

গোরা কহিলেন, "একি? আমাকে এ বরমাল্য কেন? এ হার লইয়া আমি কি করিব?"

বাদল কহিলেন, "দাদা, তুমি যে আমার রত্নভাণ্ডার! যখন যাহা ব্যয় করিয়াছি, তোমার নিকট হইতেই লইয়া করিয়াছি; যাহা সঞ্চিত হইল, তাহাও তোমার নিকটেই গচ্ছিত রাখিলাম। কুণ্ঠিত হইও না।"

বলিয়া বাদল তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রণাম করিলেন। গোরা তখন তাঁহাকে উভয় হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার চক্ষুর কোণে দুই বিন্দু অশ্রু ঝলমল করিয়া উঠিল। এই বাদলকে তিনি শিশু অবস্থায় সিংহল হইতে চিতোরে লইয়া আসিয়া মাতৃহীন অবস্থায় নিজেই লালন-পালন করিয়াছেন!

(৪)

গুপ্তচরের মুখে সংবাদ শুনিয়া, তাঁহারই কথার উপর নির্ভর করিয়া, আলাউদ্দীন নিশীথে চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভাত হইলে তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

কি বিশাল দুর্গ এই চিতোর! এ দুর্গ কি বলে দখল করা সম্ভব? তিনশত হাত উঁচু দুরারোহ পর্ব্বতের উপর এই দুর্গটী একটা বিরাট্ দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

পর্ব্বতের নিম্ন হইতে প্রাচীরের চূড়া পর্য্যন্ত সমস্তটা স্থানই ভয়ঙ্কর ঢালু—পর্ব্বতের পাষাণমণ্ডিত গাত্র কোথায় যে প্রাচীরের কঠিন পাথরের সহিত মিশিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। আলাউদ্দীন সম্মুখ যুদ্ধে দুর্গ দখল করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া দুর্গ অবরোধের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তিনি নিম্নে অবতরণ করিয়া চারিদিক্ হইতে দুর্গটী ঘেরিয়া ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈনদল পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তরে ছাউনী করিয়া দুর্গটীকে একটী গ্রেপ্তারী আসামীর মত পাহারা দিতে লাগিল। দক্ষিণ দিকে দুর্গম অরণ্য—সে দিক্‌টা উন্মুক্ত রহিল।

চিতোরের এই দুক্ষিণ দিক্‌টা আরাবল্লীর বহুদূর বিস্তৃত দুর্গম শৃঙ্খলের সহিত মিশিয়াছে। সে পার্ব্বত্য-শৃঙ্খল শত্রুর অগম্য। আলাউদ্দীন বহু চেষ্টা করিয়াও সে দিক্‌টা দখল করিতে পারিলেন না।

এই দিক্‌টা দখল করিতে পারিলে, হয় ত এ দুর্গাবরোধ অবিলম্বেই সার্থক হইত, কিন্তু এই অকৃতকার্য্যতায় তাঁহার সমস্তটা চিতোর আক্রমণ বিফল হইবার উপক্রম হইল। চিতোরীরা তাঁহার দুর্গাবরোধে বড় একটা বেশী ক্ষুব্ধ হইল না। তাহারা আরাবল্লীর উন্মুক্ত বক্ষে নির্ব্বিবাদে

কৃষিকার্য্য করিয়া খাইতে লাগিল, অফুরন্ত নির্ঝরের ধারা এবং সরোবরের জল তাহাদিগকে পানীয় যোগাইতে লাগিল।

আলাউদ্দীন বিব্রত হইলেন। এমন যে হইবে, তিনি তাহা কখনও আশঙ্কা করেন নাই। তিনি অতি গর্ব্ব করিয়াই পদ্মিনী-রত্নকে হস্তগত করিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু পদ্মিনী যে এতটা দুর্ল্লভ, তাহা তখন কে ভাবিয়াছিল! পদ্মিনী লাভ করা আলাউদ্দীনের পক্ষে যতই কঠিন বলিয়া মনে হইতে লাগিল, পাঠান বাদসাহের মনের ভিতরে পদ্মিনীর আকাঙ্ক্ষা ততই গুরুতর আকার ধারণ করিতে লাগিল। আলাউদ্দীন ভাবিতে লাগিলেন, কেমন ওই পদ্মিনী? কেমন তার মুখ, কেমন তার গড়ন? পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী! না জানি সে কি অপূর্ব্ব সামগ্রী! ওই তো সেই চিতোর-দুর্গ! ওই তো প্রাসাদের গৃহচূড়া! এত কাছে, তবু কি এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না? দিল্লীর বাদ্‌সা আমি—এও কি সম্ভব?

এতদিন পদ্মিনীকে লাভ করিবার এই আগ্রহটা আলাউদ্দীনের নিকটে একটা খেয়াল মাত্র ছিল, কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে উহা একটা জীবন-মরণের কথায় পরিণত হইল।

আলাউদ্দীন ভাবিতে লাগিলেন,—পদ্মিনী! পদ্মিনী!—আহা এ রত্ন কি আমার হইবে না? পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রূপসী সে!—সে যে দিল্লীর রংমহালেরই একমাত্র উপযুক্ত! কোন্ পদার্থের বিনিময়ে তাহাকে লাভ করা যায়! অর্থলোভে কি রাজপুতেরা এ রত্ন সমর্পণ করিবে না? কেন করিবে না! মূর্খ তারা! কতকাল এইরূপে দুর্গের ভিতরে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিবে? আমি পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস বসিয়া থাকিব; কতকাল তাহারা এইভাবে অপেক্ষা করিবে?

আলাউদ্দীন এইরূপে অনেক কষ্টে একটা বিলুণ্ঠিতা আশাকে সবলে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কালে কালে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। দু'মাস, ছ'মাস, ক্রমে বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু কৈ? চিতোরীরা বাহির হইয়া আসিল না, বা এতটুকুও কাতরতা প্রকাশ করিল না! আলাউদ্দীন ভাবিতে বসিলেন।

আলাউদ্দীন অনেক কথা ভাবিলেন। শুধু চিতোরের কথা নয়, তাঁহার নিজের কথাও অনেক ভাবিবার ছিল। অনেক দিন দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন—না

জানি তাঁহার অভাবে সেখানে কত গোলযোগই ঘটিয়াছে! বিদ্রোহ তখন পদে পদে সংঘটিত হইত! আলাউদ্দীন ভাবিলেন, রাজধানীতে যে এখনও কোনও বিদ্রোহ উপস্থিত হইতেছে না, সে কেবল তাঁহার সৈন্যবলের ভয়ে! কিন্তু এই সৈন্যবল তাঁহার কত দিন আর অক্ষুণ্ণ রহিবে? ইতি-মধ্যেই সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ ও চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। লুণ্ঠন, অত্যাচার ও আমোদ-প্রমোদের অভাবে তাহাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে! এ অবস্থার পরিণাম কি?

এক একবার আলাউদ্দীনের মনে হইতে লাগিল, কাজ নাই, থাক্—দিল্লীতে ফিরিয়া যাই। একটা তুচ্ছ নারীর জন্য কি সর্ব্বস্ব হারাইব? কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই একটা গর্ব্ব, দুরাকাঙ্ক্ষা ও আত্মাভিমান আসিয়া তাঁহার সে সংকল্পটীকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। আলাউদ্দীন কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটা প্রকাণ্ড বিপদ্ উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ পাঠান-শিবিরে এক মহামারী আসিয়া দেখা দিল। প্রতি দিন অসংখ্য সৈন্য রোগের মুখে প্রাণ দিতে লাগিল। সৈন্যেরা একেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন

এই প্রাণনাশের সম্ভাবনায় আরও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বিপদের উপর বিপদ্! আলাউদ্দীন অবশেষে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্যই প্রস্তাব করিতে লাগিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু হায়, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল। যখন সৈন্যদিগের চাঞ্চল্য ও বিদ্রোহ-ভাব লক্ষ্য করেন, তখন মনে করেন, দিল্লীতেই ফিরিয়া যাইবেন, কিন্তু অপরাহ্ণে সারাদিনের ছুটাছুটির পর শিবিরের এক কোণে, জানালার নিকটে বসিয়া চিতোরের দিকে চাহিতেই তাঁহার সংকল্প ভঙ্গ হইয়া যায়। সেই নীরস কঠিন ভীমকায় দুর্গটীর একঘেয়ে দৃশ্য, কি এক মায়ায় তাঁহাকে একবারে আকৃড়াইয়া ধরে! আলাউদ্দীন কিছুতেই তাঁহার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইবার চিন্তাকে মনে স্থান দিতে পারেন না, বাদশাহ চঞ্চল হইয়া উঠেন।

একদিন দুই দিন করিয়া সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত আলাউদ্দীন এইরূপে হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তথাপি কোনও বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না।

কিন্তু অবশেষে এমন একটী ঘটনা সংঘটিত হইল, যাহাতে আলাউদ্দীনের হৃদয় এক দিনেই স্থির হইয়া গেল!

একদিন দিল্লী হইতে এক দূত আসিয়া বাদশাহকে খবর দিল—দিল্লীতে ভয়ানক বিপদ্ উপস্থিত! মোগল সেনাপতি তুর্কীখাঁর অধীনে সহস্র সহস্র মোগল আসিয়া দিল্লী ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, অবিলম্বে তাহারা নগর আক্রমণ করিবে। সেনাপতি জাফর খাঁ উপযুক্ত সৈন্যবলের অভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি অধৈর্য্যভাবে বাদশাহের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বাদশাহ সেই দিনই অর্দ্ধেক সৈন্য দিল্লীর অভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি নিজে সেখানে আরও কয়দিন অপেক্ষা করিবার সংকল্প করিলেন। যে দিন তাঁহার অর্দ্ধেক সৈন্য দিল্লীর অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেল, সে দিন অপরাহ্ণে নিভৃতে বসিয়া আলাউদ্দীন প্রধান প্রধান উজীরদিগের সঙ্গে এক অতি গোপনীয় পরামর্শ করিলেন। ফলে, পরদিন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া মহারাণার নিকটে একখানি পত্র প্রেরিত হইল।

পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল,—"মহারাণা, আমি আপনাদের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছি। সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে একমাত্র চিতোরই দিল্লীর বাদশাহকে ব্যর্থমনোরথ করিতে সমর্থ হইয়াছে, আমি আপনাদের সঙ্গে সখ্যতা করিতে

চাই। একবার মাত্র পদ্মিনী রাণীকে দেখিতে পাইলেই আমি সন্তুষ্ট চিত্তে আপনাদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া দিল্লী ফিরিয়া যাইব। শুনিয়াছি আপনারা একান্ত অতিথি-বৎসল। আজ আমি আপনাদের অতিথি, আশা করি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন। যাহার জন্য এত কাল দিল্লী ছাড়িয়া মেবারের প্রান্তরে পড়িয়া রহিলাম, তাহার রূপ কেমন—ইহা দেখিবার জন্যই আমার এই আগ্রহ। আপনাদের আত্মাভিমানের উপর আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আশা করি, এই কথায় বিশ্বাস করিবেন। আমার এই শুভ সংকল্পের নিদর্শনস্বরূপ, আমি ইতিপূর্ব্বেই অর্দ্ধেক সৈন্য দিল্লী পাঠাইয়া দিয়াছি—বাকী সৈন্যও শীঘ্র স্থানান্তরিত করিব। মাত্র কয়েক শত সৈন্য আমার পার্শ্বচররূপে এইখানে থাকিবে। আশা করি, ইহাতে আপনাদের আপত্তি হইবে না।''

(৫)

পর দিন দুর্গশিখরের উপর দাঁড়াইয়া সেনাপতি বাদল এক অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলেন! দেখিলেন যে, একজন মাত্র অশ্বারোহী পাঠান-শিবির হইতে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে দুর্গের দিকে আসিতেছে।

অশ্বারোহীর হস্তে একখানি পত্র, সঙ্গে সন্ধির পতাকা!

বাদল অশ্বারোহীকে অক্ষত দেহে ভিতরে লইয়া আসিতে আদেশ দিলেন। আলাউদ্দীন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবেন, এ কথা তাঁহার একদিনও মনে হয় নাই। আজ এই অসম্ভাবিত সৌভাগ্যের সম্ভাবনায়, তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

অশ্বারোহী ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে, বাদল তাহাকে সঙ্গে করিয়া মহারাণার নিকটে লইয়া গেলেন। মহারাণা তাড়াতাড়ি পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথমে একটী আনন্দের আলোক ও পরে একটী বিষাদের অন্ধকার তাঁহার মুখমণ্ডলকে আসিয়া ক্রমে প্রফুল্ল ও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। পত্র পড়িয়া রাণা ভীমসিংহের অনুসন্ধানে চলিলেন।

ভীমসিংহ পত্র পড়িয়া কহিলেন, "যদি ইহাতে চিতোরের কল্যাণ হয়, তবে আলাউদ্দীনের প্রার্থনা রক্ষা করাই সঙ্গত! আগে চিতোর, তারপর পদ্মিনী। আবশ্যক হইলে চিতোরের জন্য আমি পদ্মিনীকে বিসর্জ্জন দিব!"

বাদল তরবারি বাহির করিয়া কহিলেন, "কখনও না। আপনারা রাজপুত, আপনারা চিতোরের জন্য স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু আমরা সিংহলী, প্রাণ থাকিতে কখনই উহা হইতে দিব না।"

মহারাণা হাসিয়া কহিলেন, "বালক, নিশ্চিন্ত হও, আমারও ইচ্ছা সেরূপ নহে। আমাদের নিকটে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা ও চিতোর উভয়ই তুল্য। প্রাণ থাকিতে আমরা এ উভয়ের কোনটীই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কিন্তু এখন সে কথা নয়। আলাউদ্দীন একবার মাত্র রাণীকে দেখিতে চাহিয়াছেন। চিতোরের কল্যাণের বিনিময়ে এইটুকু স্বীকার করা যায় কি না—এখন উহাই বিবেচ্য। রাণীর মর্য্যাদা খর্ব্ব না করিয়া যদি কোনও-রূপে বাদশাহের এ প্রার্থনা পূর্ণ করা যায়—তবে উভয় দিকই রক্ষা হয়। এরূপ কোন উপায় আছে কি না, এখন আমাদিগকে উহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।"

বাদল কহিলেন, "রাণীর মর্য্যাদার হানি না হইলে তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু, তাহা হইলে এ বিষয়ে রাণীর অভিমত গ্রহণ করিতে হইবে। রাণীর অভিমত কি, সর্ব্বাগ্রে জানা কর্ত্তব্য।"

মহারাণার বা ভীমসিংহের কাহারই এ কথায় কোনও আপত্তি হইল না। মহারাণা তখন ভীমসিংহের সঙ্গে স্বয়ং পদ্মিনী-প্রাসাদে গমন করিলেন।

ভীম সিংহ পদ্মিনীকে পত্র দেখাইলেন। পদ্মিনী

প্রথমে শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু কতক্ষণ পরে স্থিরভাবে কহিলেন,—"রাণা, এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি ?"

ভীমসিংহ কহিলেন, "রমণীর মর্য্যাদা ও চিতোর উভয়ই রাজপুতের প্রিয়, প্রাণ থাকিতে একটীও আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াও কোনও রূপে আলাউদ্দীনের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া যায় কি না—সেই উদ্দেশ্যেই তোমার নিকটে আসিয়াছি। তুমি একবার কথাটা ভাবিয়া দেখ।"

পদ্মিনী হাসিয়া কহিলেন, "রাণা, একদিন বিদ্রূপ করিয়া তুমি আমায় ভয় দেখাইয়াছিলে—আলাউদ্দীন সন্ধির প্রস্তাব করিলে, প্রথমেই তুমি আমাকে উপঢৌকন-স্বরূপে বাদশাহের নিকট পাঠাইবে, উত্তরে আমি চিতোরের কল্যাণ কামনায় স্বেচ্ছায় সে দুর্ভাগ্য বরণ করিব বলিয়া, প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। আজ দেখিতেছি, সেই দিন উপস্থিত! আজ আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব মহারাণাকে তুমি সংবাদ দাও।"

পদ্মিনীর এই আকস্মিক সম্মতিতে ভীমসিংহ একটুক বিচলিত হইলেন। ভীমসিংহ যতটা নির্ব্বিকার ভাবে পাঠান বাদশাহের এ প্রস্তাব রক্ষা করিবার জন্য উৎসাহ

দেখাইতেছিলেন, পদ্মিনীও যে ঠিক্ সেই ভাবেই তাহাতে সম্মতি দিবেন, তাহা তিনি মনে করিতে পারেন নাই। তিনি একমুহূর্ত্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পদ্মিনী সেইরূপ প্রফুল্ল ভাবেই কহিলেন, "কিন্তু একটা কথায় বাদশাহকে সম্মত হইতে হইবে। আমার রূপ দেখিবার জন্যই বাদশাহ এ অভদ্রোচিত প্রার্থনা করিয়াছেন, আমার দেহের সঙ্গে তাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই। তিনি আমার রূপই দেখিতে পাইবেন, দেহটী দেখিতে পাইবেন না।"

ভীমসিংহ চমকিত হইলেন। পদ্মিনী একি কথা কহিতেছে? পদ্মিনী কি কোনও চিত্রপটে আপনার সৌন্দর্য্য ভরিয়া পাঠান বাদশাহের নিকটে পাঠাইতে চাহিতেছেন? বাদশাহ কি তাহাতে সম্মত হইবেন? ভীমসিংহ কহিলেন, "পদ্মিনি, বাদশাহ তোমার জীবন্ত মূর্ত্তিটীই দেখিতে চান, ছবি কিংবা প্রতিমূর্ত্তিতে যে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, এমন মনে হয় না।"

পদ্মিনী কহিলেন, "রাণা আমি নির্জ্জীব চিত্র বা পুতুলের কথা বলিতেছি না, তিনি আমার সজীব মূর্ত্তিই দেখিতে পাইবেন! কিন্তু সে দর্পণে! আয়নার ছায়ায়!"

(৬)

চিতোরীরা যখন পদ্মিনী রাণীর এ প্রস্তাব শুনিল, তখন সকলেই তাঁহার বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। এমন ভাবে যে উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া তাহারা চিতোরকে রক্ষা করিতে পারিবে, তাহা তাহাদিগের এক বারও মনে হয় নাই। আজ অনেক দিন পরে তাহারা একটু আরাম অনুভব করিতে লাগিল। কত দিন তাহারা দুর্গের বাহির হয় নাই। এই সুদীর্ঘ একটী বৎসর বাহিরের জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক কাটাইয়া তাঁহারা যে কি কষ্টেই দিন কাটাইয়াছে, তাহা কে বুঝিবে? আজ সেই কারাবাসের অবসান হইতে চলিল,—তাহারা আনন্দে অধীর হইল।

যথাসময়ে মহারাণার অভিমত জানিতে পারিয়া বাদশাহও সন্তুষ্ট হইলেন। এত সহজে যে চিতোরীরা তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে, তাহা তাঁহার একবারও মনে হয় নাই। পদ্মিনীর অভিমতটাকেই সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার বেশী ভয় ছিল। বাদশাহের এখন মনে হইতে লাগল, এত অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁহার এই প্রস্তাবে যে পদ্মিনী রাজী হইয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার ভিতরে ভিতরে আলাউদ্দীনের

HOOGHLY COLLEGE

প্রতি একটু অনুরাগ আছে! কাটখোট্টা রাজপুতগুলিকে নির্য্যাতিত করিতে পারিলে পদ্মিনীকে হয় ত বশীভূত করা অতি সহজ হইত; সেও হয় তো কমলার মতই আত্ম-সমর্পণ করিত। কিন্তু এই কাফের জাতটাকে বশীভূত করিবার জন্য আর যে তিনি বসিয়া থাকিতে পারিতেছেন না—আপাতত সেই মহা মুস্কিল!

নারী-চরিত্রের সমস্ত নাড়ী-নক্ষত্রগুলি আলাউদ্দীন যেন আজ স্পষ্টই চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন। পদ্মিনীর চরিত্র যে সেই চরিত্র হইতে গঠন-প্রণালীতে কোনও-খানে স্বতন্ত্র তাহা তাঁহার মোটেই বোধ হইল না। তিনি এখন বার বার কেবল এই অসম্ভাবিত বিপদ্‌গুলিকে—যাহাদের জন্য তিনি এত ত্বরায় দিল্লী ফিরিতে বাধ্য হইয়াছেন—ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিন্তু উপায় তো কিছু নাই! দিল্লীতে তাঁহাকে ফিরিতেই হইবে! এই ফিরিবার মুখে শেষটা যদি ফন্দি-ফিকির করিয়া কিছু একটা করিতে পারেন—এখন তিনি বার বার তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

(৭)

যদিও মেবারের শত্রু, তথাপি রাজপুতগণ অতিথির অবমাননা করিলেন না। যে দিন পাঠান বাদশা পদ্মিনীকে

দেখিবার জন্য কয়েক জন মাত্র পার্শ্বচর লইয়া চিতোরে প্রবেশ করিলেন, সে দিন তাঁহারা তাঁহাকে নিতান্ত বন্ধুভাবেই গ্রহণ করিলেন। পদ্মিনী-মহাল সে দিন নানা বিচিত্র সাজসজ্জায় ভূষিত হইল, বাদশাহের অভ্যর্থনার জন্য নর্ত্তকী এবং গায়িকাগণ সে দিন নানা স্থান হইতে আসিয়া চিতোরে আনন্দোৎসব জাগাইয়া তুলিল! নানারূপ উপাদেয় ভোজ্য ও পেয় তাঁহার রসনাপরিতৃপ্তির জন্য সংগৃহীত হইল।

রাজপুত-সৌজন্যে এক মুহূর্ত্ত পাঠান বাদশাহ শত্রুতা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, এই যে উদারপ্রকৃতি জাতিটা, এটাকে বিনা অপরাধে নির্য্যাতন করা একান্তই অন্যায় হইয়াছে। এই সমগ্র জাতিটার বন্ধুত্ব লাভে যে সুখ—শুধু পদ্মিনী-দর্শনে কি তদপেক্ষা অধিক আনন্দের সম্ভাবনা?

কিন্তু এ সব চিন্তার কোনও স্থির মীমাংসা আলাউদ্দীন সহসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দুই পক্ষই তাঁহার হৃদয়ে প্রবল বেগে যুদ্ধ করিতেছিল। সেই যুদ্ধের ফলাফল নির্দ্ধারণের পূর্ব্বেই বাদশাহ পদ্মিনী-মহলে প্রবেশ করিলেন। তখন নৃত্য ও গানের মদিরায় তাঁহার চিত্ত বিভোর হইয়া

উঠিল। ন্যায় ও অন্যায়ের বিচার তখন অনেক দূরে সরিয়া পড়িল।

নৃত্যগীতের শেষে ভীমসিংহ বাদশাহকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেইখানে একটী পর্দ্দার আড়ালে একটী প্রকাণ্ড আয়না এককোণে দাঁড় করান ছিল। অদূরে তাহারই এক পার্শ্বে অপর একটী বৃহৎ যবনিকা কক্ষটীর এক অংশ আলাউদ্দীনের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া দিয়া ঝুলিতেছিল। সেই কক্ষে যাইয়া ভীমসিংহ বাদশাহকে সেই আয়নাটীর সম্মুখে দাঁড়াইতে কহিলেন! বাদশাহ সেইরূপ করিলে, সেই মুকুরের উপর হইতে ধীরে ধীরে যবনিকাটী সরিয়া গেল।

আলাউদ্দীন এক মুহূর্ত্ত পাথরের মত স্থির ও নিশ্চল হইয়া রহিলেন! কেহ কি অকস্মাৎ সেই গৃহে একটা বীণার ঝঙ্কার ছড়াইয়া দিল? অথবা নবাগত বসন্ত কোকিলের স্বর ও পুষ্প-পল্লব লইয়া সেই ক্ষুদ্র কক্ষটীতে আসিয়া নৃত্য করিতেছে! আলাউদ্দীন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এই এক মুহূর্ত্ত আগে যে কক্ষ নীরব ও নীরস ছিল, তাহা এক্ষণে তাঁহার নিকটে স্বর্গীয় বিভায় পরিপূর্ণ ও সঙ্গীতমুখর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল আলাউদ্দীন স্তব্ধ হইয়া দর্পণমধ্যে পদ্মিনীর রূপরাশি দেখিতে

লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সহসা দর্পণের দিকে আত্মহারা হইয়া ছুটিয়া চলিলেন।

পশ্চাৎ হইতে ভীমসিংহ কহিলেন, "শাহেন সা, ওকি করিতেছেন? সাবধান! পদ্মিনীকে অবমাননা করিবেন না!"

কিন্তু আলাউদ্দীনের তখন সংজ্ঞা নাই। তিনি ভীমসিংহের কথা গ্রাহ্যই করিলেন না। মুহূর্ত্তের জন্য বারেক মাত্র তাঁহার প্রতি চাহিয়া দ্রুতপদে একবারে দর্পণের নিকটে যাইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই আবার স্তব্ধ হইয়া গেলেন!

একি অপূর্ব্ব সংঘটন! আলাউদ্দীন দেখিলেন, দর্পণের ভিতরে সেই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি আর নাই—অকস্মাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে তথায় এক অতি তেজস্বী ও অপূর্ব্ব-দর্শন বালকের রণোদ্দীপ্ত মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়াছে! সে মূর্ত্তি কাহার? আলাউদ্দীন সে মূর্ত্তি চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু ভীমসিংহ চিনিলেন, সে মূর্ত্তি বাদলের! ভীমসিংহ আলাউদ্দীনকে হাতে ধরিয়া কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন।

ভীমসিংহ কহিলেন, "শাহেন সা, আমরা অতিথির

অবমাননা করি না, আপনি যাহাই করিয়া থাকেন, আজ তাহা মার্জ্জনীয়; কেননা, আজ আপনি অতিথি। বালকের এ ঔদ্ধত্য ক্ষমা করুন। চলুন আপনাকে আমি দুর্গের বাহিরে পৌঁছাইয়া দিই।"

আলাউদ্দীন কোনও উত্তর করিলেন না। নিঃশব্দে রাণার সঙ্গে অশ্বারোহণ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে এক ঝড় উঠিয়াছিল। সে ঝড়ের তখনও নিবৃত্তি হয় নাই। বাহিরের দিকে লক্ষ্য করিবার তখন তাঁহার অবসর ছিল না, সুতরাং ভীমসিংহের কথায় মনোযোগ করিতে পারিলেন না। আলাউদ্দীন আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন, ভীমসিংহও নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সারাটা রাস্তা আলাউদ্দীন হৃদয়ের সহিত দ্বন্দ্ব করিলেন! হৃদয় নামক একটা পদার্থ অনেক কাল তাঁহার জীবনে চাপা পড়িয়াছিল, আজ সে জাগ্রত হইবার মুখে এক কথায় ধমক খাইয়া পশ্চাৎপদ হইতে কুণ্ঠিত হইল। কিন্তু সে কুণ্ঠা বড় বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। পদ্মিনীর রূপের স্মৃতি কষাঘাতের পর কষাঘাত করিয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার সে অবাধ্যতাকে সংযত করিয়া ফেলিল।

আলাউদ্দীন ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য রূপসী

এই পদ্মিনী! এই চোখ, এই মুখ, এই অপূর্ব্ব ভ্রূযুগল, এই পুষ্পকোমল দেহ—এ সকল যে অতুলনীয়! একটা তুচ্ছ পার্ব্বত্যজাতির প্রীতির বিনিময়ে এ সকল কি উপেক্ষা করিবার সামগ্রী?—কখনও নয়! যে করিয়া হউক, এ রত্ন সংগ্রহ করিতেই হইবে; তাহাতে সর্ব্বস্ব যায় তাহাও কবুল! কিন্তু কিরূপে এই দুষ্ট জাতিটাকে সম্মতির পথে আনা যায়?

আলাউদ্দীন যত পদ্মিনীর কথা মনে করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার চিত্ত তন্ময় হইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, একদিকে সংসার, সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য সব—অপর দিকে শুধু এই পদ্মিনী! পদ্মিনী ছাড়া সবই অন্ধকার—জগৎ অন্ধকার! এই রত্নপ্রদীপ যদি সিংহাসনের পার্শ্বে না জ্বলিল, তবে সে সিংহাসনের মূল্য নাই! সে সিংহাসনের প্রলোভন তাহা হইলে অতি সামান্য! আলাউদ্দীন দিল্লীর বাদশা, তুচ্ছ একটা চক্ষু-লজ্জার খাতিরে কি আজ তিনি এ মহতী বাসনা অপূর্ণ রাখিবেন?—কখনও না!

ভাবিতে ভাবিতে আলাউদ্দীন দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন। তাঁহার পার্শ্বচরগণ তাঁহার অগ্র-পশ্চাতে মুক্ত-তরবারি হস্তে যাইতেছিল, ভীমসিংহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন; সঙ্গে তাঁহার কোনও ভৃত্য বা অনুচর

ছিল না। আলাউদ্দীন একবার মাত্র পশ্চাৎদৃষ্টি করিয়া এই সব দেখিয়া লইলেন। একটা পৈশাচিক আলোক তাঁহার মুখে হঠাৎ হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিল।

ক্রমে তাঁহারা পর্ব্বত অবতরণপূর্ব্বক দুর্গের শেষ ফটকের নিকটে আসিলেন। সামান্য কয়েকজন প্রহরী এইস্থানে রুদ্ধদ্বার রক্ষা করিতেছিল। বাদশাহের আগমন মাত্র তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল।

ফটকের বাহির হইয়া ভীমসিংহ কহিলেন, "সম্রাট্, এইখানে আমার আতিথ্যের শেষ! এইবার যদি আপনি কোনও অসৌজন্য প্রদর্শন করেন, তবে তরবারি দ্বারাই তাহার প্রত্যুত্তর করিব, আতিথ্যধর্ম্মের হিসাবে নয়! তবে এখন বিদায়!"

বলিয়াই ভীমসিংহ পশ্চাৎ ফিরিলেন;—উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দুর্গে প্রবেশ করিতে ছিলেন, কিন্তু এমন সময়ে আলাউদ্দীন ডাকিয়া ফিরাইলেন। কহিলেন,—"মহারাজ!"

বিস্মিত ভীমসিংহ পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। কহিলেন,—"সম্রাট্!"

আলাউদ্দীন একটু ইতস্ততঃ করিলেন। তারপর

বলিলেন,—"আপনার সৌজন্যে আমি পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি, কিন্তু পদ্মিনীকে আমি কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। আমাদের এ বন্ধুত্বের খাতিরে চিতোরের, কল্যাণ-কামনায় তাহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন—আমাদের এ প্রীতি চিরস্থায়ী হউক!"

ভীমসিংহ অসি উন্মুক্ত করিলেন। আলাউদ্দীনের মতলব ইতিপূর্ব্বেই তিনি অনেকখানি সন্দিহান হইয়াছিলেন, কিন্তু এমন ভাবে সহসা যে তিনি এই সরল আতিথ্যের অবমাননা করিবেন, তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। কহিলেন, "সম্রাট্, সংযত ভাবে বাক্য প্রয়োগ করুন। আতিথ্যের ধর্ম্ম এইখানেও আপনাকে অনুসরণ করে নাই, বলিয়াছি;—পুনঃ এরূপ অসঙ্গত—"

ভীমসিংহ কথা সমাপ্ত করিতে পারিলেন না। অবিলম্বেই আলাউদ্দীন পার্শ্বচরদিগকে এক অতি ভীষণ ইঙ্গিত করিলেন।—মুহূর্ত্তে ভীমসিংহ বন্দী হইলেন! আলাউদ্দীন তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়া দুর্গের মুখে ছুটিয়া গেলেন।

দুইজন পাঠান আসিয়া ভীমসিংহকে অশ্ব হইতে টানিয়া

নামাইল। ভীমসিংহ মোটেই এই আকস্মিক ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তথাপি একজনকে আঘাত করিতে ছিলেন, কিন্তু এমন সময়ে অদূরে বহু সংখ্যক পাঠান-অশ্বারোহীর আগমন ধ্বনি শুনিয়া নিরস্ত হইলেন।

দুর্গের ফটকে বা তন্নিকটে যে রাজপুত-সেনা ছিল, তাহা খুব প্রচুর নহে। ভীমসিংহ বুঝিলেন, বলপ্রকাশ এখানে নির্বুদ্ধিতা! অগত্যা তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। ক্রোধে তাঁহার গণ্ডযুগল আরক্তিম হইয়া উঠিল, প্রবল তাড়িতস্রোত তাঁহার নয়নযুগল ভেদ করিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যেও স্পষ্ট জ্বলিতে লাগিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া অস্পষ্টস্বরে তিনি উচ্চারণ করিলেন,—"যদি একবার মুক্ত হইতে পারি!—"

কিন্তু তখন পাঠানেরা আসিয়া তাঁহাকে একবারেই ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, সবলে ধরিয়া শিবিরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—মুখের কথা সবটা ফুটিয়া বাহির হইতে পারিল না, চিন্তাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গেল। ভীমসিংহ নীরবে, মনের ক্ষোভ মনে চাপিয়াই, তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

কয়েক জন প্রহরী দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিল, কিন্তু

তাহারা ফটক ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে পারিল না; তাহাদের উপরে তেমন অনুমতি ছিল না। তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিলে জন কয়েক সৈনিক নিকটবর্ত্তী ঘাটী হইতে দৌড়িয়া আসিল। কিন্তু পাঠানের দল শিকার লইয়া তখন অনেক দূর সরিয়া পড়িয়াছে! নিরুপায় হইয়া তাহারা ফটকের উপরে উঠিয়া ঘন ঘন ভেরীধ্বনি করিল।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত চিতোরনগরী চঞ্চল হইয়া জাগিয়া উঠিল।

পদ্মিনী রাণী নিজকক্ষে বসিয়া পাঠান বাদশাহের এই কৃতঘ্ন ব্যবহারের কথা শুনিতে পাইলেন; এক মুহূর্ত্ত তিনি স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। সত্যই কি পাঠান বাদশা আতিথ্যের মস্তকে আজ এতবড় একটা পদাঘাত করিলেন? জগতের কি এতখানি অবনতি হইয়াছে? এ যে বিশ্বাসের অতীত! পদ্মিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া একটী বাতায়ন-পথে বাদশাহের শিবিরের দিকে চাহিলেন! তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গেল, অধর দন্তপীড়িত হইল, গ্রীবা ঋজু ও উন্নত হইয়া উঠিল!

শিকার-শেষে ব্যাধেরা যেমন লুণ্ঠিত প্রাণীর চারিদিকে নৃত্য করিয়া করিয়া উৎসব করে, পদ্মিনী দেখিলেন, পাঠানেরাও তেমনি বহুসংখ্যক মশাল জ্বালিয়া শিবিরে তখন আমোদ-প্রমোদ করিতেছে।

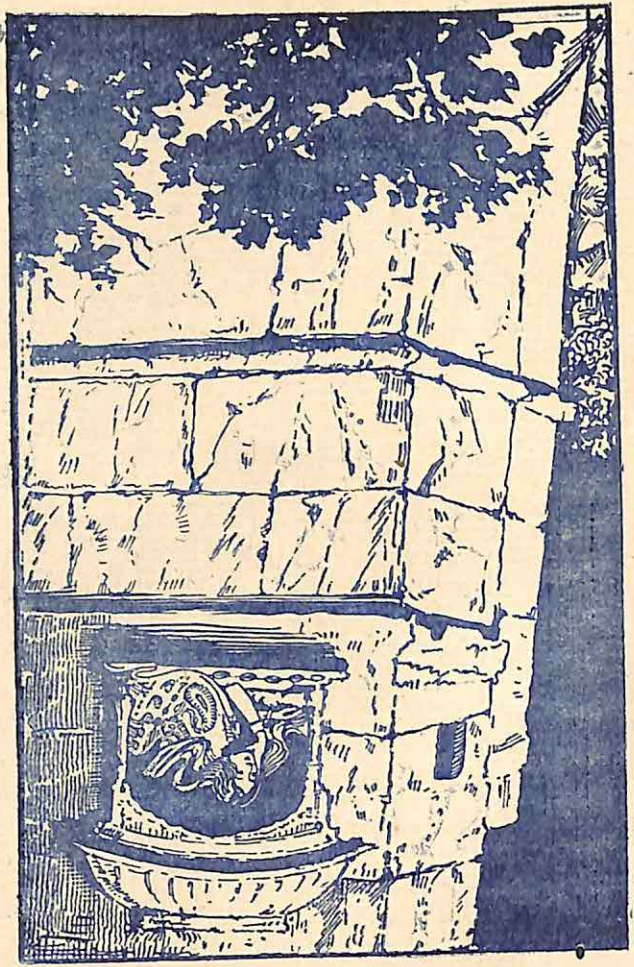

পদ্মিনী

চতুর্থ খণ্ড

শঠে শাঠ্যং

(১)

পরদিন পদ্মিনী শুনিলেন, আলাউদ্দীন সংবাদ পাঠাইয়াছেন, যদি পদ্মিনীকে অবিলম্বে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হয়, তবেই ভীমসিংহ মুক্তি পাইবেন; নতুবা তাঁহাকে দিল্লীতে

লইয়া গিয়া প্রাসাদের দরজায় পিঁজরায় পূরিয়া রাখা হইবে! —ভীমসিংহকে চিড়িয়া-খানার বাঁদর সাজিতে হইবে!

শুনিয়া পদ্মিনী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ভাবিতে বসিলেন। তাঁহার পদ্মের পাপরীর মত মসৃণ গণ্ডস্থল দু'টী, নবরবির কিরণে পূর্ব্বাকাশের মত, রঞ্জিত হইয়া উঠিল; কর্ণের কুণ্ডল দু'টী স্পন্দিত হইতে লাগিল।

সেদিন রাত্রিতে পদ্মিনী একটুও ঘুমাইতে পারিলেন না। কখন ছাদে উঠিয়া পাইচারী করিতে লাগিলেন, কখনও ছাদের প্রস্তর-বেষ্টনীটী ধরিয়া দূরে পাঠান-শিবিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কখনও বা গৃহে আসিয়া বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কত কি চিন্তা তাঁহার! শুধু তো প্রিয়তমের বিরহ-অনল নহে। চিতোরের অদৃষ্ট-প্রান্তরে এক অতি ভয়াবহ দাবানলের সূত্রপাত হইয়াছে, সেই দাবানলের পলিতা তাঁহারই হাতে!—তিনি কি আজ উহা নিজহস্তে প্রজ্বালিত করিবেন? চিতোরকে কি স্বহস্তে পোড়াইবেন? নিজের তুচ্ছ অস্তিত্বের জন্য, চিতোরের অস্তিত্ব লুপ্ত করিবেন?

পদ্মিনী বেশ বুঝিতে পারিলেন, শুধু ভীমসিংহকে পিঁজরায় পূরিয়াই আলাউদ্দীন ক্ষান্ত হইবেন না। ভীমসিংহের

চিন্তামগ্না পদ্মিনী।

অভাবে চিতোর কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, যখনই আলাউদ্দীন সেটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তখনই আবার আসিয়া চিতোরের দ্বারে দাঁড়াইবেন! পদ্মিনী মরিয়া গেলেও শুধু প্রতিহিংসা লইবার জন্যই আলাউদ্দীন আবার আসিবেন। তখন কি হইবে?

পদ্মিনী স্পষ্ট বুঝিলেন, প্রাণ দিয়া, আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও চিতোরকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। চিতোরের একমাত্র ভরসা ভীমসিংহ! ভীমসিংহ যদি ফিরিয়া আসেন, তবেই চিতোর এখনও রক্ষা পাইতে পারে; নতুবা সব নিস্ফল—সব আকাশকুসুম! কিন্তু কি করিয়া ভীমসিংহকে তিনি আজ ফিরাইয়া আনিতে পারেন? প্রকাশ্য যুদ্ধে আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করা যে কঠিন, তাহা পদ্মিনী বেশ জানিতেন! বিশেষ এই এতকালের অবরোধের পরে! আলাউদ্দীনের সহস্র সহস্র সেনার সম্মুখে চিতোরের ক্ষুদ্র রাজপুত-বাহিনী কতক্ষণ টিকিয়া থাকিবে? কিন্তু প্রকাশ্য যুদ্ধ ছাড়াই বা উপায় কি? গোপনে ছদ্মবেশে যদি কেহ পাঠান-শিবিরে ঢুকিয়া, কারারক্ষীকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া, বন্দীকে মুক্ত করিতে পারে—তবে কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু সে ভারই বা গ্রহণ করিবার

লোক কৈ? এমন সুচতুর সাহসী পুরুষ চিতোরে কেহ আছে কি? রাজপুতের মধ্যে সাহসী পুরুষের অভাব নাই, কিন্তু সাহস অপেক্ষা এখানে কৌশলের প্রয়োজন যে অধিক! রাজপুত প্রাণের মায়া রাখে না, কিন্তু প্রাণ দিয়া যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তবে সে প্রাণদানের কিছু সার্থকতা নাই! পদ্মিনী দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তেমন অবস্থায় ফল আরও গুরুতর ঘটিবে। আলা-উদ্দীন ঘুণাক্ষরেও এ ষড়যন্ত্রের আভাষ পাইলে, ভীমসিংহের উদ্ধারের ভরসা মুকুলেই লয়প্রাপ্ত হইবে!

পদ্মিনী ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্য আর এক-দিক্ দিয়া তাঁহার চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইল। আচ্ছা, যদি তিনি আত্মসমর্পণ করেন? তাঁহার নিকটে তো এই হীরক-অঙ্গুরীয়ক আছে! ভীমসিংহ মুক্ত হইবামাত্রই তিনি ইহা চুষিয়া খাইতে পারেন। কিন্তু আলাউদ্দীন যদি তৎ-পূর্ব্বেই পদ্মিনীর নিকটে আগমন করেন? অথবা যদি পদ্মিনীকে পাইয়াও তিনি ভীমসিংহকে মুক্তি না দেন! বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস কি? তবে উপায়?

পদ্মিনী ভাবিলেন, বাদশাহের নিকট একটা প্রস্তাব করা যাইতে পারে। উপকথায় রাজকন্যারা কোন দৈত্য

কিংবা লম্পটের হাতে পড়িলেই ছল করিয়া বসিতেন—তাঁহাদের অমুক ব্রত আছে, এতদিন পর্য্যন্ত নির্জ্জনে থাকিতে হইবে! সে পর্য্যন্ত যেন কেহ নিকটে না যায়!—দৈত্যেরা প্রায়ই সে কথা শুনিতেন! আলাউদ্দীন কি শুনিবেন না? পদ্মিনী ভাবিলেন, কেন শুনিবেন না? ভীমসিংহ তাঁহার পতি, ভীমসিংহ তাঁহার ভর্ত্তা;—যে পর্য্যন্ত না ভীমসিংহ পাঠান-শিবির হইতে প্রস্থান করেন, সে পর্য্যন্ত পদ্মিনী কিরূপে বেগম হইতে পারেন?—এ আপত্তি তো তিনি বেশ যুক্তিযুক্ত ভাবেই পাঠান-বাদশাহের নিকটে উপস্থিত করিতে পারেন। তবু কি তিনি তাঁহাকে মুক্তি দিবেন না! নিশ্চয় দিবেন। তবে কি এই উপায়ই শ্রেষ্ঠ?

কিন্তু যদি আলাউদ্দীনকে আরও একটু প্রতারিত করা যায়? যদি একটা শূন্য শিবিকা পাঠাইয়াই আলাউদ্দীনকে বোঝাইতে পারা যায় যে, এই শিবিকার মধ্যেই পদ্মিনী রহিয়াছেন, ভীমসিংহের মুক্তিদিন পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবেই লুক্কায়িত রহিবেন, তবে বোধ হয় পদ্মিনী নিজকেও বাঁচাইতে পারেন! প্রাণের জন্য নয়, মানের জন্য তো পদ্মিনী এটা করিতে পারেন? এটা করিবেন কি? এ শঠতায় কি পাপ আছে? 'শঠে শাঠ্যং'—শাস্ত্রেরই তো বচন!

শাঠ্যই যদি করিতে হয়, তবে আর তাহাতে ভাল মন্দ কি ?

পদ্মিনী চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মুখে একটী অতি মধুর হাসির রেখা অঙ্কিত হইয়া উঠিল, তাঁহার ভ্রূযুগল কৌতুক-কুঞ্চিত হইল ; পদ্মিনী অধর দংশন করিয়া অস্ফুটস্বরে পুনঃ কহিলেন,— "পাঠান, অস্ত্র যুদ্ধে তুমি দুনিয়া জয় করিয়াছ, কিন্তু ছল যুদ্ধে তোমাকে আমার নিকটে পরাভব মানিতে হইবে।"

তারপর শয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

(২)

পরদিন দু'প্রহরে চিতোরেশ্বরীর মন্দির হইতে পূজা শেষ করিয়া আসিয়া পদ্মিনী দেখিলেন—বাদল উপস্থিত।

পদ্মিনী কহিলেন, "সেনাপতি যে!" বাদল কহিলেন, "সেনাপতি কি না, সে কথার অন্ত রফা হইবে। পিসিমা, দরবারে আজ একি শুনিয়া আসিলাম? এ কথা কি সত্য ?"

পদ্মিনী হাসিয়া কহিলেন, "কোন্ কথা সেনাপতি ?"

বা। এই যে তুমি না কি পাঠান—

বাদল কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না, বাকী অংশটুকু যেন তাঁহার গলায় বাঁধিয়া গেল। বাদল ক্রমাগত ঢোক গিলিতে লাগিলেন।

পদ্মিনী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ বৎস, এতদিন বসিয়া বসিয়া তোমাদের বীরত্ব দেখিলাম, এইবার একটু পাঠানদের বিক্রমটা দেখিব!"

বাদলের চক্ষু ঠিক্‌রাইয়া উপরে উঠিল! স্থির দৃষ্টিতে পদ্মিনীর দিকে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বাদল কহিলেন,—"দোষটা কি আমাদের হইল? কেন রাণা অমন কাহাকেও কিছু না বলিয়া দুর্গ ত্যাগ করিলেন? আমি সেনপতি—আমার উপরে এমন কলঙ্কভার চাপাইবার তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল?"

পদ্মিনী কহিলেন, "বৎস, রাগ করিও না। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখন আমি করিব। সে জন্যই আমি পাঠান শিবিরে যাইতেছি। আর তোমাকও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

"আমাকে!" বলিয়া বাদল অসি কোষমুক্ত করিলেন! কহিলেন, "পিসিমা, আমি সেনাপতি থাকিতে কখনও তোমাকে সে শিবিরে যাইতে দিব না। তুমি ক্ষেপিয়াছ

নিশ্চয়! অথবা এ তোমার একটা তামাসা! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

পদ্মিনী হাসিলেন। কহিলেন, "বৎস, সেজন্য চিন্তা নাই! সেনাপতিত্ব তোমার কাল থাকিতেছে না! কাল পাঠান-শিবিরে শত শত দোলা যাইবে, প্রতি দোলার সঙ্গেই চারিজন করিয়া বাহক থাকিবে। কাল তুমি সেই দোলারই একজন বাহক!

বাদল চমকিত হইলেন। এ আবার কি পরিহাস? কোন গোপনীয় অভিসন্ধি ইহার ভিতরে আছে কি? নিশ্চয়! কি আশ্চর্য্য! বাদল এতক্ষণ এ কথাটা ধরিতে পারেন নাই। বাদল পদ্মিনীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন; লক্ষ্য করিতে করিতে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিলেন।

বাদল কহিলেন, "পিসিমা, এতখানি সাহস তোমার? আশ্চর্য্য! আমি এতক্ষণ এ কথাটা বুঝিতে পারি নাই। তুমি আমাকে বোকা বানাইলে! সবগুলি বাহকই তবে আমাদের মত যোদ্ধারাই হইবে?"

পদ্মিনী হাসিয়া কহিলেন, "কেবল বাহক নয় সেনাপতি, বাহনগুলিও তোমাদিগকেই হইতে হইবে! স্বয়ং রাণীর শিবিকায় কাকাজী গোরা যাইবেন!"

বাদল হাসিয়া কহিলেন, "চমৎকার! বাদশা তাহা হইলে মূর্চ্ছা যাইবেন, নিশ্চয়! কিন্তু হাতিয়ার গুলা?"

প। তাহাদিগের স্থানও শিবিকার মধ্যেই করিতে হইবে। ঢাল-সরকিওয়ালা শিবিকা-বাহক তো আলা-উদ্দীন আর সহ্য করিতে পারিবেন না?

বাদলের চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। উৎসাহে, আনন্দে তাঁহার সুগঠিত ক্ষুদ্র দেহখানিতে একটা চাঞ্চল্যের জোয়ার আসিয়া দেখা দিল। বাদল কহিলেন,—"পিসিমা, পাঠানের শঠতার এইবার উপযুক্ত প্রতিশোধ! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, কল্য নিশীথেই ভীমসিংহ মুক্ত হইবেন, নিশ্চয়। তাঁহাকে মুক্ত করিতে না পারি তো সমক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, সেনাপতিত্ব সত্য সত্যই তবে পরিত্যাগ করিব।"

(৩)

ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া আলাউদ্দীন ভরসা করিতে ছিলেন যে, এইবার পদ্মিনী-পাখী ধরা পড়িবে, কিন্তু পদ্মিনী যে নিজে অগ্রগণ্যা হইয়া তাঁহাকে এত শীঘ্র বরণ করিতে আসিবেন, তাহা তিনি মনেও স্থান দিতে পারেন নাই।

আলাউদ্দীন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কতকালের আশা-তরু আজ মুকুলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সুদীর্ঘ একটী বৎসর তিনি এই রত্নের প্রলোভনে সকল ছাড়িয়া রাজপুতনার এই নীরস, নিরানন্দ প্রান্তরে পড়িয়া রহিয়াছেন। দিল্লীর রঙ্গমহালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আমোদ-প্রমোদ বা রূপসীগণ তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। মরীচিকার মত শুদ্ধ এই একটী আশার অঞ্চল ধরিয়া তিনি সকল মর্ত্ত্যের সুখসম্ভোগকে তুচ্ছ করিয়াছেন, সেই মরীচিকা আজ আকার ধরিয়া সত্য সত্যই তাঁহাকে বরণ করিতে আসিতেছে! আলাউদ্দীন কি করিয়া এখন চিত্ত স্থির রাখিবেন?

পদ্মিনীর সেই মদিরাসিক্ত আঁখিযুগল, আবেশকুঞ্চিত ভ্রুযুগ এবং কুসুম-সুকুমার করপল্লব—যাহা আলাউদ্দীন এই সে দিন চাক্ষুষ করিয়া আসিয়াছেন—ঘন ঘন তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সেই সুখময় স্মৃতিগুলির সঙ্গে কত কল্পনার মোহময় ছবি জড়াইয়া জড়াইয়া পাকাইয়া পাকাইয়া কত অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব আলেখ্য গড়িয়া তাঁহার মানসপটে উদিত হইতে ছিল, আলাউদ্দীন উহাদের মধ্যে পড়িয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিলেন। পদ্মিনীর প্রস্তাব তাঁহার

নিকটে তখন আর এতটুকুও অসঙ্গত বিবেচিত হইল না।

পদ্মিনী, সম্রাট্‌কে দর্শন দিবার পূর্ব্বে ভীমসিংহের মুক্তি চাহিয়াছেন! যে পর্য্যন্ত না ভীমসিংহ পাঠান-শিবির ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যান, সেপর্য্যন্ত তিনি যাহাতে তাঁহার সাত-শত অসূর্য্যম্পশ্যা সঙ্গিনী লইয়া স্বতন্ত্র শিবিরে বাস করিতে পারেন, সে প্রার্থনা জানাইয়াছেন। আলাউদ্দীন কি তাঁহার এ প্রথম আবদার অগ্রাহ্য করিবেন? এ প্রার্থনা তো অন্যায্য নহে। কি করিয়া পদ্মিনী তাঁহার ভর্ত্তার সম্মুখে আলাউদ্দীনের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে পারেন? ভীমসিংহকে যত শীঘ্র পারা যায় দূর করিয়া দেওয়াই যে সঙ্গত। ভীমসিংহ পদ্মিনীর স্বামী!—তাঁহার স্মৃতিও যে এখন আলাউদ্দীনের অসহ্য! আলাউদ্দীন ভাবিতে লাগিলেন, এখন শুধু পদ্মিনীর শিবিকাটী পৌঁছিলেই হয়!

পদ্মিনী যে ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার হইয়া গিয়াছেন, ভীমসিংহ যে এখন তাঁহার কেহই নহেন—এ বিষয়ে আলা-উদ্দীনের আর এখন বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না! আলাউদ্দীন অসহিষ্ণু হৃদয়ে, মুগ্ধ নয়নে শুধুই পদ্মিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। উত্তম বেশভূষা

করিয়া, চিতোরের পথ পানে চাহিয়া চাহিয়া প্রহর গুণিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্নের ভাস্কর যখন খরতর কিরণ বর্ষণের পরে শ্রান্ত হইয়া পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িলেন, তাঁহার সুবর্ণ রশ্মি যখন হাসিতে হাসিতে চিতোরের গৌরবময় ললাটের উপর ছড়াইয়া পড়িল, আলাউদ্দীন তখন উৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া দেখিলেন, চিতোরের সাতটা ফটক খুলিয়া দলে দলে লোক নীচে নামিয়া আসিতেছে!

সেই সুদীর্ঘ জনসঙ্ঘের মধ্যে আলাউদ্দীন বহু সংখ্যক শিবিকা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কোন্‌টীতে পদ্মিনী রহিয়াছেন, আলাউদ্দীন তাহা জানিবার জন্য এক দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। শিবিকাশ্রেণী যত নিকট-বর্ত্তী হইতে লাগিল, আলাউদ্দীনের হৃদয়টীও পুলকাতিশয্যে ততই কম্পিত হইতে লাগিল। আলাউদ্দীন দেখিলেন,—শিবিকার পর শিবিকা—অসংখ্য শিবিকা—নানা মূল্যবান্ আচ্ছাদনে মণ্ডিত হইয়া কেমন বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া সর্পের মত শ্রেণীবদ্ধভাবে আসিতেছে। এ সর্প যে কখনও তাঁহাকে দংশন করিতে আসিবে, আলাউদ্দীনের মনে তাহা এক

মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পাইল না। তাঁহার চক্ষু তখন সাপের মাথায় মণিটী কোথায়—সে অনুসন্ধানেই ব্যস্ত! —মণি কাড়িয়া লইতে গেলে যে দংশন করিতে আসাই সর্পের ধর্ম্ম, তখন তিনি তাহা একবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। সাত রাজার ধন মাণিকটী পাইলে তিনি কতটা কৃতার্থ হইবেন,—তখন কেবল সেই চিন্তাই করিতে লাগিলেন।

ক্রমে শিবিকাস্রোত আসিয়া পাঠান-শিবিরের ফটকের সম্মুখে ঠেকিল, তখন পাঠানেরা তাহাদিগকে পদ্মিনীর শিবির দেখাইয়া দিল।

বাদশাহের তাম্বুর অদূরে এক অতি বৃহৎ পট্টমন্দিরের ভিতরে নানা বিলাসোপকরণ-সজ্জিত পদ্মিনীর আবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রাজপুতেরা সেই সাতশত শিবিকা লইয়া ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে প্রবিষ্ট হইল। তখন একজন রাজপুত সর্দ্দার আসিয়া বাদশাহের নিকটে ভীমসিংহের মুক্তি প্রার্থনা করিল।

বাদশাহ কহিলেন, "আমার ইহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই; ভীমসিংহ এখন আমার বন্ধু! আমি আজই তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া দিল্লীতে চলিয়া যাইব। তোমরা তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে লইয়া যাও।"

বাদশাহ তাহাদিগকে ভীমসিংহের কারাগার দেখাইয়া দিলেন। রাজপুতেরা সেই দিকে চলিয়া গেলেন।

দু'তিন জন মাত্র রাজপুত সর্দ্দারের সঙ্গে ভীমসিংহ অশ্বারোহণে চিতোরের মুখে চলিয়া গেলেন। পাঠানেরা কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না, রাজপুতেরাও একটী কথা কহিল না। আপন শিবিরের মধ্যে থাকিয়া বাদশাহ চাহিয়া চাহিয়া ভীমসিংহকে নির্ব্বিবাদে চিতোরে পৌঁছিতে দেখিলেন। রাজপুতেরাও পদ্মিনীর শিবিরের মধ্যে থাকিয়া, নীরবে আনন্দোৎফুল্ল নয়নে সেই দৃশ্য দেখিলেন।

ভীমসিংহ চিতোরে পৌঁছিলে, আলাউদ্দীন পদ্মিনীর শিবিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু এমন সময় এক তুমুল গণ্ডগোল চারিদিক্ কম্পিত করিয়া বাদশাহের শিবিরে আসিয়া পৌঁছিল। বাদশাহ গবাক্ষ-পথে মুখ বাহির করিয়া পদ্মিনীর শিবিরের পানে চাহিয়া দেখিলেন—কি সর্ব্বনাশ!—সহস্র সহস্র রাজপুত উন্মুক্ত তরবারি হস্তে পাঠানদিগকে আক্রমণ করিতেছে!

এক মুহূর্ত্ত আলাউদ্দীন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন; ব্যাপার কি ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাঁহার মনের মধ্যে একটা দারুণ সন্দেহের

ছায়া আসিয়া প্রকটিত হইল। আলাউদ্দীন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।—বাহির হইতে যাইবেন, এমন সময়ে সেনাপতি মালেক কাফুর আসিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! ভীষণ প্রতারণা! শিবিকার মধ্যে একটীও স্ত্রীলোক নাই—সব রাজপুত যোদ্ধা! তাহারা পাঠানসেনা ছিন্নভিন্ন করিয়া চিতোরের দিকে পলাইতেছে! কি হুকুম হয়?"

আলাউদ্দীনের মুখশ্রী ভীষণ হইয়া উঠিল, চক্ষু ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতে চাহিল, নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল! সজোরে উভয় হস্তে শ্মশ্রুগুচ্ছ আকর্ষণ করিতে করিতে বাদশাহ কহিলেন, "কাফের! এতদূর আস্পর্দ্ধা তোমার! আজ সমূলে সকলকে বিনাশ করিব!"

তারপর আলাউদ্দীন পলাতক রাজপুতদিগকে অনুসরণ করিবার জন্য সমস্ত পাঠানবাহিনীকে অনুমতি প্রদান করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে ভীষণ কোলাহলে, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় গগনমণ্ডল পূরিয়া গেল। যে রক্তলোলুপা সমর-রাক্ষসী এতকাল পর্য্যন্ত সুযোগের অভাবে পড়িয়া পড়িয়া কেবলই ঘুমাইতেছিল, তাহা আজ জাগ্রত হইয়া রক্ত-পিপাসায় যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল! রাজপুত ও পাঠান উভয়েই মরিয়া হইয়া, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, পরস্পরকে আক্রমণ করিল।

উভয় পক্ষের সঞ্চিত ক্রোধ, রুদ্ধস্বর্ণা আজ যেন অস্ত্রের, মুখে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। মৃত্যুর বিভীষিকা লইয়া বর্ষা ও তরবারিগুলি ইতস্ততঃ বিদ্যুতের মত ঝলসিতে লাগিল।

(৪)

বাদলকে লইয়া গোরা ভারী বিপদে পড়িলেন। অতুল বিক্রমে পাঠানসেনা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া রাজপুত সর্দ্দারেরা প্রায় সকলেই দুর্গের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু বাদল কিছুতেই ফিরিতেছেন না! বাদল একবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন! বিদ্যুতের মত তাঁহার তরবারি ঘুরিতেছে, বজ্রের মত তাঁহার বর্ষা পাঠান যোদ্ধার বক্ষে বিদ্ধ হইতেছে, প্রলয় কল্লোলের মত তাঁহার "মার, মার" ধ্বনি রণক্ষেত্র প্রকম্পিত করিতেছে!

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! পাণ্ডব-সেনাপতি ক্ষুদ্র অভিমন্যু একদিন সপ্তরথীকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন—এ বুঝি তাই! চিতোর-সেনাপতি ত্রয়োদশবর্ষীয় বাদলও আজ সমগ্র পাঠানসেনাকে একবারে মথিত করিয়া তুলিল। পাঠানেরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল, রাজপুতেরা উল্লাসে কেবলি বিজয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

যেখানে বাদল যুদ্ধ করিতেছিলেন, গোরা চাহিয়া

দেখিলেন, সেখানে রাজপুত আর বড় নাই। গোরা প্রমাদ গণিলেন। দূরে অসংখ্য পাঠান কোলাহল করিয়া সেইদিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। গোরা বুঝিলেন, এইবার শেষ চেষ্টা! এইবার বাদলকে না রক্ষা করিতে পারিলে, আর আশা নাই। এখনও যে কয়টী পাঠান বাদলকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, তাহারা খুব প্রচুর নহে; তাহাদিগকে অনায়াসেই বিনষ্ট করা যাইতে পারে, কিন্তু নূতন সেনা আসিলেই সব শেষ!

গোরা মুক্ত অসি হস্তে নিমেষে বাদলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন পাঠানেরা উভয়কেই আক্রমণ করিল।

গোরার প্রতাপেও পাঠানেরা চমকিত হইয়া গেল। এ যে বাদলেরই দোষর। কি অপূর্ব্ব ইহার অস্ত্র শিক্ষা, কি অদ্ভুত ইহার হস্তসঞ্চালন। এ বালক ও এ বৃদ্ধ কে? তাহারা অনেক যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু এরূপ অপূর্ব্ব বীরত্ব তো আর দেখে নাই! বালক ও বৃদ্ধের বাহুতে যে এত বল থাকিতে পারে তাহা তাহারা আজ এই নূতন দেখিল। তাহারা হটিবে কি তিষ্ঠিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

গোরা কহিলেন, "বাদল, ফের, ফের, আমাদের উদ্দেশ্য

সিদ্ধ হইয়াছে, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। প্রবল বন্যার মত ঐ দেখ নূতন পাঠান-সৈন্য আসিতেছে, এখনই জোয়ারের মত সব ভাসাইয়া লইয়া যাইবে; সময় থাকিতে অশ্বের মুখ ফেরাও।"

কিন্তু বাদলের তখন মোটেই হুঁস্ নাই। রণমদিরা তখন তাঁহার মস্তিষ্কে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে, বাদল কেবলই যুদ্ধ করিতেছেন। গোরার কথায় কর্ণপাতই করিলেন না।

গোরা চেঁচাইতে লাগিলেন, অনুরোধ করিলেন, হাত ধরিয়া টানিলেন—কিন্তু বাদল বধির! গোরা প্রমাদ গণিলেন।

দেখিতে দেখিতে পাঠানেরা আসিয়া উভয়কে ঘেরিয়া ফেলিল। প্রবল জলস্রোতের মত তাহাদের বেগ উভয়কে অনেক দূর পর্য্যন্ত সরাইয়া লইয়া গেল, বাদল একবারে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন। গোরা ইষ্ট নাম জপ করিতে করিতে বাদলকে আড়াল করিয়া দৃঢ় ভাবে সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

এতক্ষণ গোরা শুধু বাদলকে রক্ষা করিবার জন্যই অস্ত্রক্ষেপণ করিতেছিলেন, কিন্তু এইবার পতন নিঃসন্দেহ

জানিয়া প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এইবার আর শুধু আত্মরক্ষা নহে। এইবার গোরার প্রধান লক্ষ্য শত্রু-দলন। মৃত্যু তো অনিবার্য্য! এইবার যতটা শত্রু ধ্বংস করিয়া যাওয়া যায়! গোরা তলোয়ার হস্তে একটা মহা-সমুদ্রের মত সেই পাঠান-সেনার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিশাল বাহুর চাপে অনেক পাঠান ভূম্যবলুণ্ঠিত হইল।

তারপর গোরা যে যুদ্ধটা করিলেন, তাহা আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে! সেই দুইখানি বাহুর সঞ্চালনে সমস্তটা পাঠান-বাহিনী একবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

গোরার অস্ত্রের মুখে যে অগ্নি সঞ্চারিত হইতে লাগিল, তাহার বিভীষিকা পাঠানদিগকে অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিল। শত শত, সহস্র সহস্র পাঠান তাঁহার অস্ত্রের পরিধি পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। বাদল নিকটে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। গোরা যে এত বড় যোদ্ধা, বাদল তাহা একদিনও টের পান নাই। একটা গর্ব্ব, একটা আত্মগরিমা ও উৎসাহের আলোক তাহার সুন্দর শ্রান্ত মুখখানিতে ফুটিয়া উঠিল। বাদল আনন্দে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বাহব্বা!

ঠকুর্দ্দা, বাহব্বা! মার, কাটো, ধ্বংস কর—ধ্বংস কর!"

গোরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তরবারি দ্বিগুণ বেগে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। গোরার এমন দিন আর কখনও হয় নাই! এই মহাযাত্রার পথে তাঁহার আদরের বাদল, তাঁহার নয়নমণি বাদল, তাঁহার চিরপালিত বাদল তাঁহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আজ তাঁহাকে বাহবা দিতেছে, হে সংসার-বন্ধনমুক্ত মহাপথের যাত্রিক, এতদপেক্ষা তোমার আর কি প্রলোভনের সামগ্রী আছে? সেই তুমুল হত্যাকাণ্ডের মধ্যেও গোরার চক্ষে হঠাৎ জল আসিবার উপক্রম হইল, গোরার হৃদয় ভরিয়া উঠিল!

হঠাৎ গোরার অশ্ব আহত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। কিন্তু গোরা এক মুহূর্ত্তে সামলাইয়া উঠিলেন; ভূমিতে দাঁড়াইয়া পূর্ব্ববৎই অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বাদল তাড়াতাড়ি নিজের অশ্ব হইতে নামিয়া গোরাকে তাহাতে আরোহণ করিতে বলিলেন; কিন্তু গোরা কিছুতেই সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না।

গোরা কহিলেন, "বাদল, এইবার যদি পার আত্মরক্ষা কর ভাই, আমার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে, দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইতেছে, আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না—"

বাদল অগ্রসর হইয়া গোরাকে ঢাকিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর আবার নিজে অস্ত্র চালনা করিতে লাগিলেন।

গোরাকে অভিভূত হইতে দেখিয়া পাঠানেরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। পিছন হইতে সেনাপতি কাফুর ডাকিয়া কহিলেন "মারো—কাফের মারো—লড়াই ফতে!—এইবার এই বাচ্ছাটাকে মারিয়া ফেল—"

কিন্তু বাচ্ছাটাকে মারিয়া ফেলা বড় সহজ হইল না। যতক্ষণ গোরা যুদ্ধ করিয়াছিল, বাদল ততক্ষণ তাঁহার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিয়াছিল, তাঁহার শ্রান্ত কলেবর সেই অবসরে অনেকটা বিরাম পাইয়াছিল। এইবার বাদল আবার পূর্ণ বিক্রমে পাঠানদিগকে আক্রমণ করিল। পাঠানেরা বিব্রত হইয়া পড়িল।

কিন্তু সে কতক্ষণ? অগণিত পাঠান-সৈন্যের প্রতাপে ক্রমশই বাদল নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন; বাদলের অশ্বও নিহত হইয়া পড়িল। বাদল তখন ভূমিতে দাঁড়াইয়াই অস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, গণ্ড বহিয়া ঘর্ম্ম পড়িতেছে! সৈন্যের পর সৈন্য নিহত করিতেছেন, কিন্তু কৈ, শেষ কোথায়? বাদল দেখিলেন, যাহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল,

তাহাদের অধিকাংশই গোরার হাতে নিহত হইয়াছে; কিন্তু দূরে আরও এক দল পাঠান সৈন্য কোলাহল করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে!

বাদল বুঝিলেন, এইবার আর রক্ষা নাই, এইবার তাঁহার পালা আসিয়াছে! তখন দিবসের আলো অন্তর্হিত হইয়াছে, রজনীর আগমনে আকাশে অগণ্য তারকা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই তারকালোকে যুদ্ধক্লান্ত প্রান্তরখানি একটা স্বপ্নের আলেখ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে! বাদল ভাবিলেন,—মন্দ কি? এই শোণিতরঞ্জিত প্রান্তরে, ওই হীরকখণ্ড-শোভিত অসীম নীলচন্দ্রাতপতলে, জীবনের একমাত্র অবলম্বন গোরার পার্শ্বে দেহ রক্ষা করিয়া মরিতে পারিলে, সে তো ভাগ্য! বাদল শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে একটা অদ্ভুত জয়োল্লাস চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া উঠিল।

দেখিতে না দেখিতে, বুঝিতে না বুঝিতে কোথা হইতে অকস্মাৎ একটা জলপ্রপাতের মত সৈন্যস্রোত নামিয়া আসিয়া এক মুহূর্ত্তে সেই যুদ্ধোন্মাদ সমস্তগুলি পাঠান সৈন্যকে ভাসাইয়া লইয়া গেল!

বাদল ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ভীমসিংহ

চিতোর হইতে পুনঃ ফিরিয়া আসিলেন কি ? কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বাদল একজন অশ্বারোহীকে নিকটে দেখিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন। সেই অস্পষ্ট ক্ষীণ নক্ষত্রালোকেও তাহার উজ্জ্বল মুখখানি বাদলকে প্রতারিত করিতে পারিল না। বাদল চিনিলেন, সে আর কেহ নহে—অরুণ সিংহ !

"অরুণ ! অরুণ !"

বাদল ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলেন, কিন্তু অরুণ অশ্ব হইতে নামিলেন না। কহিলেন, "বাদল, ছুঁইও না আমাকে—নরাধম আমি !—প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিয়াছি ! এখনও অনেক পাঠান সৈন্য ওই দিকে গোল করিতেছে—আগে তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিয়া আসি—তার পর পুনঃ দেখা হইবে।"

বলিয়াই অরুণ সিংহ অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। বাদল পশ্চাতে ডাকিতে লাগিলেন—"এইখানে !—অরুণ, ঠিক এইখানে—মনে রাখিও ! এইখানেই আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিব। তুমি না ফিরিলে আমিও ফিরিব না, দেখো যেন ভুলিও না !"

অন্ধকারে অস্পষ্ট একটা "আচ্ছা" শব্দ দূর হইতে ফিরিয়া আসিল। বাদল তখন গোরার নিকটে ফিরিয়া গেলেন।

গোরাকে খুঁজিতে আসিয়া বাদল আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! বাদল দেখিলেন, গোরা আর নাই; গোরার প্রাণপাখী উড়িয়া গিয়াছে!—কিন্তু গোরার দেহখানি যে অপূর্ব্ব শয্যায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, তাহা দেবদুর্ল্লভ!

শোনিতরঞ্জিত কোমল দূর্ব্বাদলের উপরে গোরা শুইয়া আছে! রাশি রাশি মৃতদেহ তাঁহার উপাধানের কার্য্য করিতেছে! গোরা একটাকে মাথার নীচে দিয়াছে, দু'টাকে পদতলে ফেলিয়াছে, দুই হস্তে যতটা পারে টানিয়া বামে ও দক্ষিণে শবরাশি স্তূপাকৃতি করিয়া তুলিয়াছে!

বাদল অস্ত্র ফেলিয়া কতক্ষণ সেই শবস্তূপের নিকটেই বিস্মিত নয়নে বসিয়া রহিলেন; তারপর নিজেও অনেক মৃত দেহ টানিয়া আনিয়া গোরার পার্শ্বে সাজাইয়া দিতে লাগিলেন।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় অরুণ সিংহ ফিরিয়া আসিলেন।

বাদল কহিলেন, "দেখ অরুণ! কি অপূর্ব্ব শয্যা! এই শয্যায় দাদা আমার আজ চিরকালের জন্য শয়ন করিয়াছেন! স্বর্গ কি ইহার চেয়েও মধুর!"

অরুণ সিংহের চক্ষে জল আসিল। অরুণ কহিলেন, "বাদল, আমার ভাগ্যে এ শয্যা নাই! কি অপরাধ করিয়াছি বাদল, যে এই সময়েও একটা সামান্য সৈনিকের মত চিতোরের জন্য যুদ্ধ করিতে পারিলাম না?"

বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়ে বাদল অরুণের দিকে চাহিলেন। অরুণ আবার কহিতে লাগিলেন, "বাদল, পাঠান নির্ম্মূল করিয়াছি, আলাউদ্দীনকেও দূর করিয়া দিয়াছি—কিন্তু তবু শান্তি নাই। কেহ তো আমায় এ যুদ্ধে ডাকে নাই! মরিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু মৃত্যুও আমাকে দেখিয়া পলাইয়াছে। জীবন ভার হইয়া উঠিয়াছে। বলিতে পার, কি হইলে আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়?"

বাদল কহিলেন, "অরুণ, কেন ক্ষোভ করিতেছ? চল, আমার সঙ্গে চল। আমি মহারাণাকে আজ অনুরোধ করিব। আজ তোমার বীরত্বেই চিতোর নিষ্কণ্টক হইয়াছে, নিশ্চয় মহারাণা তোমায় ক্ষমা করিবেন। আবার চিতোর তোমায় কোল পাতিয়া লইবে।"

অরুণসিংহ মস্তক অবনত করিলেন। কহিলেন, "বাদল, দুরাশা! দুরাশা! চিতোরে আর আমার স্থান নাই, চিতোরে ঢুকিবার আশা আমি বহুদিন পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি

কেবল চিতোরের সুখ-দুঃখেরই ভাগী হইবার প্রয়াসী। সুখের দিনে স্মরণ না কর, অন্ততঃ দুর্দ্দিনে আমায় স্মরণ করিও, তবেই আমি কৃতার্থ হইব।"

বাদল বিস্মিত হইলেন। অরুণের মুখের দিকে চাহিলেন। এ কথার অর্থ কি?

অরুণ মস্তক ঈষৎ উত্তোলন করিলেন। বাদলের বিস্মিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"বাদল! বুঝিতে পারিতেছ না? কি করিয়াই বা বুঝিবে! সে যে সম্পূর্ণ অভিনব! এই সব ভীলদের দেখিতেছ—"

বাদল আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, একটা কথা তিনি এখনও অরুণকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। এই সব ভীলেরা —কাহারা? অবলীলাক্রমে তাহারা অরুণের জন্য সমর-ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে গিয়াছিল—জলপ্রপাতের ন্যায় তাহাদের সেই নির্ভীক আক্রমণ এখনও বাদলের চক্ষুর সম্মুখে জ্বলিতেছে! বাদল অরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অরুণ, ইহাদের কোথায় পাইলে?"

অরুণ কহিলেন,—"বাদল, চিতোরের সিংহাসনের বিনিময়ে আজ আমি ইহাদের হৃদয়-সিংহাসনে স্থান পাই-য়াছি,—এ সিংহাসনও তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি মহিমময়! এক

ভীলকুমারী আমায় এ সিংহাসনের অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিয়াছে; বিনিময়ে আমি তাহাকে আমার হৃদয়ের অর্দ্ধেক দান করিয়াছি। আজ আমি ভীলদের অধিপতি!"

বাদলের মনে হইল, এ যেন স্বপ্ন! সত্যই কি অরুণসিংহ এমন কার্য্য করিয়াছেন? মহারাণার সর্ব্বজ্যেষ্ঠপুত্র আজ অসভ্য ভীলরমণীর প্রণয়মুগ্ধ! বাদল কি উত্তর করিবেন, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

অরুণসিংহ বাদলের অবস্থা বুঝিলেন। কহিলেন, "ভয় পাইও, না বাদল! সে রমণী নিতান্তই ভীল নহে! ভীলের সংশ্রবে আজ সে ভীল বলিয়া পরিচিত হইতেছে সত্য; কিন্তু তাহার ধমনীতেও অতি বিশুদ্ধ রাজপুত শোণিত বহিতেছে! তাহার পিতা চন্দানরংশোদ্ভব! আহেরিয়ার দিনের সেই কথা মনে কর! সেই অপূর্ব্বা ভীলবালিকাকে কি তোমার মনে আছে?"

বাদল কহিলেন, "হাঁ, আছে। সে যে অতি সুন্দরী! কে সে?"

অরুণ কহিলেন,—এই ভীলদের সর্দ্দারের একমাত্র কন্যা! আজ আমার আশ্রয়দাত্রী—জীবন-মরণের সঙ্গিনী!"

বাদল। তোমার বিবাহিতা পত্নী?'

অরুণ। তার চেয়েও অধিক! আমার জীবনের ধ্রুবতারা, নয়নের আনন্দ, অস্ত্রশিক্ষা-গুরু, ইহকাল-পরকালের সাথী! তার সঙ্গে সম্বন্ধ আমার কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার নহে!

কিশোরবয়স্ক বাদলের এত কথা বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। বিস্ফারিত নেত্রে বাদল কহিলেন,—

"সত্যই কহিয়াছ, অরুণ! চিতোরে তোমার আর স্থান নাই! অনেক দূর সরিয়া পড়িয়াছ। কি সর্ব্বনাশ করিলে!"

(৫)

পাঠানের হাতে চিতোর রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু গোরা ও অরুণ সিংহের কথা মনে করিয়া চিতোরীরা আনন্দ করিতে পরিল না।

গোরা যে এত বড় যোদ্ধা, তাহা চিতোরীরা একদিনের জন্যও টের পান নাই। স্বর্গের দেবতা ছদ্মবেশে তাহাদের নিকটে আসিয়া ছদ্মবেশেই আবার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! তাঁহার প্রাপ্য অর্ঘ চিতোরীরা কি প্রকারে এখন তাঁহার নিকটে পৌঁছাইয়া দিবে?

আর অরুণ সিংহ? হায়, রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষে

দুইটী পুত্রস্নেহকাতর নয়ন সেই মুখখানি মনে করিয়া কি যে অশ্রু বর্ষণ করিল, তাহা কে বুঝিবে? মহারাণার রুক্ষ নয়নদুইটীর পানে সেই চোক্ দু'টী একটী নির্ব্বাক্ নিবেদন লইয়া বার বার কতই না কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল! কিন্তু মহারাণার মন তাহাতে এতটুকুও কাতর হইল না; কর্ত্তব্যের দাবী তাহার সম্মুখে নত হইল না!

আসন্না-বিধবা গোরা-পত্নী পতির মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বাদলকে ডাকিয়া কহিলেন—"বাদল, একবার তোমার ঠাকুর্দ্দার বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা কর, আমি হাসিতে হাসিতে তাঁহার অনুসরণ করি। কিরূপে তোমার দাদা যুদ্ধ করিয়াছিলেন?"

বাদল সেই কাহিনী বর্ণনা করিলেন। গোরা যেরূপে পাঠান সেনা ধ্বংস করিয়াছিলেন, একা শত শত শত্রুর সঙ্গে লড়িয়াছিলেন, অন্তিম সময়েও শত্রুর মৃতদেহ দিয়াই শয্যা রচনা করিয়াছিলেন, বাদল সব কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বলিয়া গেলেন। গোরা-পত্নীর চোক্ ফুটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। সে অশ্রু শোকের না আনন্দের?

সে কাহিনী একবার শুনিয়া গোরা-পত্নীর তৃপ্তি হইল না। তিনি আবার সে কাহিনী শুনিতে চাহিলেন, বাদল

আবার তাহা বর্ণনা করিলেন। গোরাপত্নী আরও একবার সে কাহিনী শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন বাদল আরও একবার কহিলেন।

তখন বিধবা হাসিতে হাসিতে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরের দিকে ছুটিলেন। গোরার মৃতদেহ সেইখানে সৎকারার্থ আনীত হইয়াছিল। চিতা সজ্জিত হইল।

চিতোরের যত নরনারী পুষ্পমাল্য লইয়া, সেইখানে সমবেত হইয়া তাঁহার গায়ে চন্দন ও কুঙ্কুম লিপ্ত করিয়া দিলেন। সতী তখন হাসিতে হাসিতে চিতার উপরে উঠিয়া পতির পার্শ্বে শয়ন করিলেন। পুরোহিত অগ্নি ধরাইয়া দিলেন!

নানারূপ বাদ্য-ভাণ্ড, জয়ধ্বনি ও ধূমপুঞ্জের মধ্যে সকলের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া সতীর দেহ স্বর্গে চলিয়া গেল।

পদ্মিনী

পঞ্চম খণ্ড

আবার মেঘ

(১)

দিল্লীর ওপারে যমুনার তীরে তাঁবুর ভিতরে বসিয়া তুর্কী-খাঁ ও করণ রায়! উভয়ে কথোপকথন হইতেছিল। এক জন দোভাষী পরস্পরকে পরস্পরের বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছিলেন।

তুর্কী-খাঁ কহিলেন, "সংবাদ পাওয়া গেল, আলাউদ্দীন ফিরিয়া আসিতেছেন! এখন কি করা কর্ত্তব্য?"

করণ রায় কহিলেন, "অবিলম্বেই সহর অধিকার করা আবশ্যক। আলাউদ্দীন পৌঁছিলে দুর্গ দখল করা সুকঠিন হইবে।"

তুর্কী-খাঁ কহিলেন, "আমরা এখনও দুর্গের অবস্থা কিছু জানিতে পারি নাই। জাফর খাঁর অধীনে কত সৈন্য আছে, সে কথাটা আগে জানা চাই!"

করণ রায় কহিলেন, "সেজন্য চিন্তা নাই। আমি লোক নিযুক্ত করিয়াছি, অদ্যই সে সংবাদ লইয়া আসিবে। আমার সঙ্গে পঞ্চাশ জন মোগল সৈনিক দিবার আদেশ করুন!

তুর্কী-খাঁ কহিলেন, "আপনি কোথায় যাইতে চান?"

করণ রায় উত্তর করিলেন—"বাদশাহের প্রাসাদে! আগে কমলকে হস্তগত করিব, তারপর অন্য কাজ!"

তুর্কী খাঁ কহিলেন, "আপনি যে পূর্ব্বে আপনার কাজ গুছাইতেই ব্যস্ত! পূর্ব্বে দুর্গ দখল করিলে ভাল হয় না কি?"

করণ রায় কহিলেন, "আপনি ভুল বুঝিতেছেন।

কমলাকে না পাইলে দুর্গ অধিকার করিবেন কিরূপে? সমস্ত খবরই যে সে জানে!"

তুর্কী-খাঁ। জানিলেই আপনাকে যে বলিবে তাহার তো কিছু নিশ্চয়তা নাই?

করণ রায় মস্তক অবনত করিলেন। কহিলেন,—"মোগল সেনাপতি! সে দায় আমার!"

তুর্কী-খাঁ আর প্রতিবাদ করিলেন না। তখনই পঞ্চাশ জন মোগল সৈনিককে ডাকিয়া করণ রায়ের অনুগামী করিয়া দিলেন।

* * *

গভীর রাত্রিতে কমলা বেগমের ঘরের কাছে চুপি চুপি দুইজন লোক আসিয়া দাঁড়াইলেন। একজন স্ত্রীলোক, একজন পুরুষ!

পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বেগমের গৃহ?

স্ত্রীলোক কহিল, "এই!"

পুরুষ কহিলেন, "ঘরে কে আছে?"

স্ত্রীলোক কহিল, "আর কেহ নাই—শুধুই বেগম!"

পুরুষ কহিলেন, "ব্যস্, এখন তা'হলে তুমি যাইতে পার; দরজায় এই অঙ্গুরীয়ক দেখাইও; সিপাহী তোমায়

লোলুপ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য আজ দিল্লীর বেগম হইয়াছি! সেই জন্যই রাণীর নাম জাল করিয়াছি!"

করণ রায় স্তম্ভিত হইলেন, চমকিত হইলেন, বিস্মিত হইলেন! একি কথা! এও কি সম্ভব? ছাদ ফুড়িয়া হঠাৎ যদি একটা বজ্র সেই সময়ে কক্ষখানিতে গড়াইয়া পড়িত, তাহা হইলেও বোধ হয় তিনি এত বিস্মিত হইতেন না। পুলকে, বিস্ময়ে ও উৎকণ্ঠায় তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিল। তিনি কহিলেন—"মতিয়া, এ যে বিশ্বাসের অযোগ্য! সত্যই কি তাই? সত্যই কি কমলা নির্দ্দোষী!"

মতিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ঊর্দ্ধে দেখাইলেন। কহিলেন, "কমলাদেবী এখন ওইখানে—তিনি ত এ পৃথিবীর নন! দিল্লীশ্বর তাঁহাকে জোরে বন্দী করিতে চাহিয়াছিলেন—কমলা বলিয়া অপর কাহাকেও না পাইলে, বোধ হয়, তাহাই করিতেন! আমি তাঁহাকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি; কমলা সাজিয়া আমিই রাজ্ঞীর অদৃষ্টটাকে মাথা পাতিয়া লইয়াছি; পুরস্কারস্বরূপ দিল্লীর সিংহাসনের এই অংশটা পাওয়া গিয়াছে!"

বলিয়া মতিয়া একটু হাসিলেন, করণ রায় সেদিকে লক্ষ্য করিলেন না। একটা স্বস্তি ও প্রীতির হিল্লোল তখন তাঁহার

মুখখানির উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল ; করণ রায় একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। তারপর কহিলেন, "মতিয়া, আমি তোমার উপর অবিচার করিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর। তোমার এ ঋণ আমি জন্মে শোধ করিতে পারিব না ; জগতে তুমিই যথার্থ মনুষ্যত্বশালিনী !—কি করিয়া তোমার নিকটে আজ আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব ? তের বৎসরের উত্তপ্ত মরুভূমি আজ শীতল হইল !"

তারপর কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার কহিলেন,— "কিন্তু দেবলা, দেবলা কোথায় ? দেবলাও কি তাহা হইলে আত্মহত্যা করিয়াছে ?"

মতিয়া কহিলেন, "না মহারাজ, দেবলা আত্মধ্বংস করে নাই, দেবলা এখনও বাঁচিয়া আছে। দেবগিরির রামদেবের পুত্রের তত্ত্বাবধানে তিনি এখন নিরাপদে বাস করিতেছেন। দিল্লীশ্বরের কবল হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি এখানে আরও একটা জাল মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি ; দিল্লীশ্বরকে আর একটা ছলনায় ভুলাইয়াছি !"

করণ রায় কহিলেন, "মতিয়া, আমি চলিলাম। না বুঝিয়া তোমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিলাম, ঈশ্বর

আমায় সে দুষ্কার্য্য হইতে রক্ষা করিলেন ; আর আমার ক্ষোভ নাই।”

বলিয়া করণরায় দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন। মতিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

গৃহের বাহিরে যাইয়া করণরায় দেখিলেন, অদূরে দীর্ঘ শ্মশ্রুবিমণ্ডিত এক দীর্ঘ পুরুষ পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া সে ব্যক্তি কহিল,—“কে তুই ?”

করণরায় কহিলেন, “তুমি কে ? আমি গুর্জ্জরেশ্বর করণরায় ! আলাউদ্দীনকে একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম, না পাইয়া মনের দুঃখে ফিরিয়া চলিলাম। আবার একদিন আসিব।”

সে ব্যক্তি কহিল, “আর আসিতে হইবে না, আজ তোর শেষ দিন,—বাদশাহ ফিরিয়া আসিয়াছেন—এখনই তোর শিরোচ্ছেদ হইবে।”

বলিয়া সেই ব্যক্তি হঠাৎ একটী তুড়িধ্বনি করিল। দেখিতে দেখিতে চারিজন ভীষণ দর্শন খোঁজা আসিয়া করণরায়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

করণরায় কহিলেন, “অত কাণ্ড-কারখানার দরকার ছিল কি ?—আমি স্বেচ্ছায় আত্ম সমর্পণ করিতেছি। একবার

শুধু আলাউদ্দীনকে পাইলে হইত! শুধু একটা কথা তাহাকে বলিবার ছিল।"

সেই ব্যক্তি কহিল—"ঐ খাসমহলে আয়, তোর বক্তব্য শ্রবণ করিব—আমিই দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন! তোর বাসনা পূর্ণ হইবে।"

খাসমহলে ঢুকিয়া আলাউদ্দীন কহিলেন, "এইবার তোর বক্তব্য বল্—এক দণ্ড সময়! আমি সময় নষ্ট করিতে পারি না। তোকে বধ করিয়া আবার আমাকে মোগল তাড়াইতে হইবে! কি সাহসে তুই আমার বেগম মহলে ঢুকিয়াছিস্? কে তোকে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে?"

করণরায় সে সব প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া এক অতি বিকট হাস্য করিয়া কহিলেন, "আলাউদ্দীন! পাঠান! আজ তোমার পরাজয়! কমলাকে তুমি বেগম করিয়াছ, ভাবিতেছিলে? উন্মত্ততা! তাহার ছায়াও তুমি মাড়াইতে পার নাই। আমার বাঁদী মতিয়ার চরণেই তোমার মস্তক লুণ্ঠিত হইয়াছে—আজ দিল্লীর বাদ্‌শা ও গুর্জ্জরের বান্দা সমান!"

বলিয়াই করণরায় বিদ্যুতের মত বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে

একখানি ছুরিকা টানিয়া বাহির করিলেন। তারপর দেখিতে না দেখিতে সজোরে আপন বক্ষে বসাইয়া দিলেন!

বিস্মিত, স্তম্ভিত আলাউদ্দীন দেখিলেন, তাঁহার সমস্তটা প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিকে বিদ্রূপ করিয়া দিয়া করণরায় নিমেষে এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন!

* * * *

পরদিন সকালে তুর্কীখাঁ সংবাদ পাইলেন, আলাউদ্দীন হঠাৎ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন; করণরায় ধরা পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন! তুর্কীখাঁ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কারণরায়ের পরামর্শে, করণরায়ের উত্তেজনাতেই হঠাৎ তিনি এই অজ্ঞাত, অপরিচিত স্থানে হাজার হাজার মোগল লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন! সেই করণরায়ের অভাবে কিরূপে এখন তিনি পাঠানের সঙ্গে লড়িবেন? বিশেষতঃ, অবস্থা শোচনীয় না হইলে করণরায়ই বা আত্মহত্যা করিবেন কেন? তাঁহার সঙ্গে তো যথেষ্ট অনুচর ছিল! অন্ততঃ, কৃতকার্য্য না হউন, আত্মরক্ষার জন্য তো তিনি চেষ্টা করিতে পারিতেন! কিন্তু কৈ—তাহাও তো তিনি করেন নাই! মোগল সেনাপতি ভাবিলেন, —নিশ্চয় এবার রক্ষা নাই। আলাউদ্দীন দুর্গে থাকিয়া

আত্মরক্ষা করিবে, আর সুযোগ বুঝিলেই এই জনহীন, আশ্রয়হীন প্রান্তরে আমাদিগকে গলা টিপিয়া টিপিয়া মারিবে! অতএব প্রত্যাবর্ত্তনই শ্রেয়!

তুর্কীখাঁ সেই দিনই শিবির তুলিতে হুকুম দিলেন!

ঘুম হইতে উঠিয়া পরদিন দিল্লীবাসিরা সবিস্ময়ে দেখিল,—রাত্রির অন্ধকারে তাম্বু ভাঙ্গিয়া হাজার হাজার মোগল কোঁথায় একদিকে সরিয়া পড়িয়াছে!

(২)

মোগল চলিয়া গেল, রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল, সকলেই আনন্দ অনুভব করিলেন, কিন্তু আলাউদ্দীন শান্তি খুঁজিয়া পাইলেন না।

চিতোরের পরাজয় এবং পদ্মিনীর রূপের কথাটা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। পদ্মিনীর অভাবে, এই বিস্তৃত পাঠান-রাজ্যটা যেন তাঁহার নিকটে নিতান্তই শূন্য শূন্য বোধ হইতে লাগিল। কি করিয়া পদ্মিনীকে লাভ করিবেন, কি করিয়া চিতোরকে নিষ্পেষিত করিবেন, দিবা-রাত্রি তিনি কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা, খামখেয়ালীর হুজুগে অপ্রস্তুত অবস্থায় চিতোর আক্রমণ করা যে সমীচিন হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন;

তাই এবার এক অতি বৃহৎ আয়োজন জুড়িয়া দিলেন।

এক বৎসর নয়, দু'বৎসর নয়, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া আলাউদ্দীনের এক বিরাট সমর-সজ্জা চলিল। তারপর একদিন পাঠানসৈন্যেরা রণডঙ্কা বাজাইয়া আবার চিতোরের অভিমুখে ছুটিয়া গেল।

রাজপুতেরা দেখিলেন, এবার আর তিন দিক নয়, চারিদিক হইতেই পাঠানেরা চিতোরকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে! আরাবল্লীর ঘন অরণ্যের মধ্যেও এবার পাঠান-সেনার ঘাঁটী বসিয়াছে!

দ্বাদশ বৎসর পরে এবার যে পাঠানেরা চিতোরের সঙ্গে শেষ রফা করিতে আসিয়াছে, তাহা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিলেন, তাহারা সজল-নয়নে একবার চিতোরের দিকে চাহিলেন।

আপন কক্ষে উন্মুক্ত মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া পদ্মিনী-রাণী ভীমসিংহকে কহিলেন,—"আমার জন্য সর্ব্বনাশ হইল! কেন তুমি এ শত্রু ঘরে আনিয়াছিলে? আমাকে বাদশাহের নিকটে প্রেরণ কর, আমি পথে বিষ খাইয়া মরিব।"

ভীমসিংহ কহিলেন, "পদ্মিনী রাজস্থানের পদ্ম! তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়া কোন্ রাজপুত প্রাণ ধরিয়া থাকিবে? রাজপুতের সে প্রবৃত্তি থাকিলে, অনেক পূর্ব্বেই সে কার্য্য হইত! তোমাকে আর স্মরণ করাইয়া দিতে হইত না। আমি সে প্রস্তাব অনেকবার করিয়াছি।"

পদ্মিনী চক্ষু মুছিলেন। এ পোড়া জীবনের জন্য কি তবে সকলই যাইবে? এ সোণার চিতোর অকালে ভস্ম হইবে? কেন বিধাতা তাহাকে এ অভিশপ্ত রূপ দিয়া তৈরী করিয়াছিলেন? কেন পদ্মিনীকে কুরূপা-কুৎসিতা করেন নাই!

পদ্মিনী দেবতার মন্দিরে যাইয়া অনেক মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন। অনেক অশ্রুবর্ষণ, ক্রন্দনের পর তাঁহার হৃদয় কথঞ্চিত শান্ত হইল। পদ্মিনী তখন উঠিয়া মন্দিরের ভৈরবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

ভৈরবী কহিলেন, "মা, কেন দুঃখ করিতেছ? ঐ শুন স্বর্গের দুন্দুভি বাজিতেছে, মা আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন! একবার ঐ প্রতিমার পানে চাহ, সকল দুঃখের অবসান হইবে! কি দেখিতে পাইতেছ মা?"

পদ্মিনী কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু স্থির

হইয়া গেল! কি মহিমময়ী আকৃতি! ভূচর, খেচর, জলচর—তাঁহার পদতলে গড়াইতেছে; ভূলোক, দ্যুলোক, পাতাল—তাঁহার লোম-কূপে-কূপে একসঙ্গে মিশিয়াছে; সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস, ভ্রূভঙ্গীতে বিরাজ করিতেছে! কি ছার এই সংসার!

পদ্মিনী উঠিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সমস্তটা বহির্জ্জগৎ তখন তাঁহার নিকটে নিতান্তই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হৃদয়ের স্তরে স্তরে এক অতি অপূর্ব্ব আলোক ফুটিয়া উঠিল। বীণার ঝঙ্কারের মত মায়ের ডাক মর্ম্মে মর্ম্মে শিঞ্জিত হইতে লাগিল!

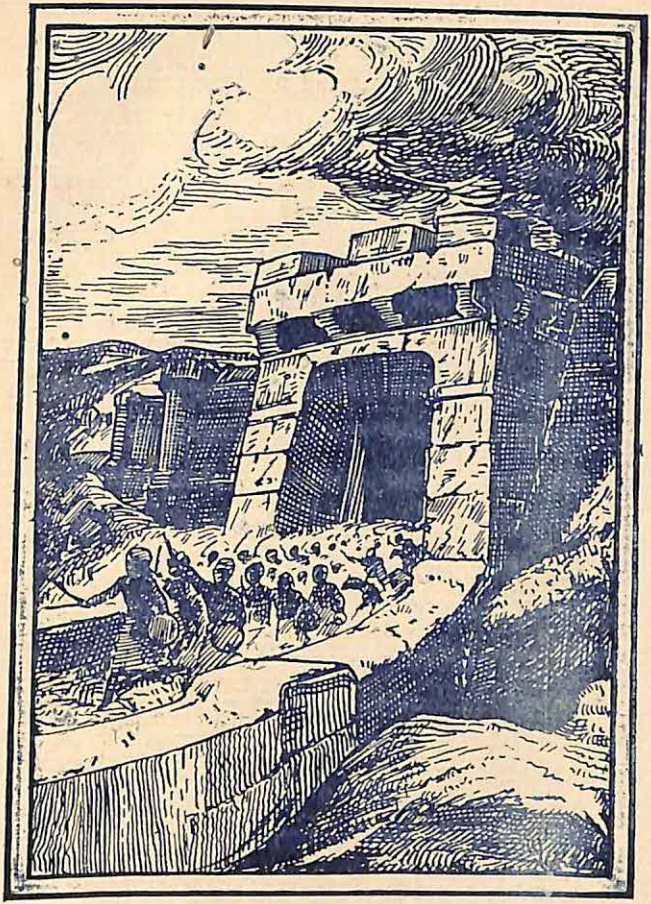

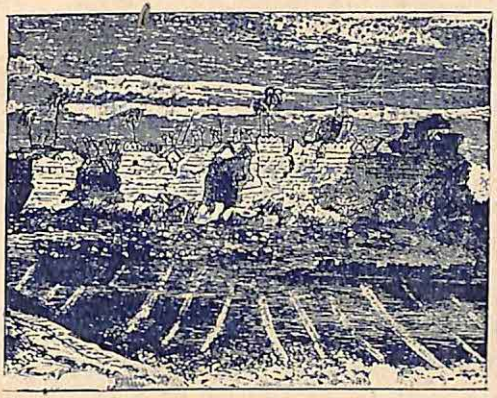

পদ্মিনী

—:০:—

ষষ্ঠ খণ্ড

বর্ষণ-শেষ

(১)

সন্ধ্যার সিঁদূর রাগ পশ্চিমাকাশের গায় মিলাইয়া গিয়াছে; প্রদোষের অন্ধকার চারিদিক্ গ্রাস করিতে করিতে সেই ভীলদের দেশখানিতেও আসিয়া ছড়াইয়া

পড়িয়াছে ; আকাশে মৃদু মৃদু নক্ষত্রালোক দেখা দিয়াছে ;—এমন সময়ে একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরের নিকট বসিয়া অরুণসিংহ !

অরুণসিংহের হৃদয় চিন্তামগ্ন। দূরে—চিতোরের দুর্গচূড়ায় প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে অসংখ্য বাতি, উপরের নক্ষত্রপুঞ্জের মতই জ্বলিয়া উঠিত, অরুণসিংহ বসিয়া বসিয়া প্রত্যহই সেই শোভা দেখিতেন, কিন্তু আজ সপ্তাহকাল সে বাতি জ্বলিতেছে না ! অরুণসিংহের চিন্তার বিরাম নাই।

আজ দুইমাস পাঠানের সঙ্গে চিতোরের সংঘর্ষ উপস্থিত। এই দুই মাসে চিতোরের বীরগণ একে একে সকলেই নিঃশেষিত হইয়াছেন। অরুণসিংহ সেই নির্ঝরের তীরে বসিয়া ভীলদের নিকটে সকল সংবাদই পাইতেছেন। কিন্তু তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত কেহই ডাকে নাই। অরুণসিংহের হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রাজ্য ছাড়িয়া বনবাসী হইয়াছেন, সে জন্য তাঁহার দুঃখ ছিল না—যে ঘরে মুন্না অধিষ্ঠাত্রী, সে ঘর তো স্বর্গ !—কিন্তু চিতোর যদি তাঁহাকে এই বিপদের কালেও স্মরণ করিত !

অরুণসিংহের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। কতদিন, কতদিন অরুণসিংহ এইভাবে অশ্রুমোচন করিয়াছেন, কিন্তু তবু তো তাঁহার হৃদয় শান্ত হয় নাই !

কাহার কোমল করস্পর্শে অকস্মাৎ অরুণসিংহের চমক ভাঙ্গিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, মুন্না আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়াছে। ক্ষণেক তাঁহার মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া মুন্না করুণস্বরে কহিল,—"চল, ঘরে চল!"

অরুণসিংহ কহিলেন, "মুন্না, কতকাল এইভাবে কাটিবে? আর তো সহ্য করিতে পারি না। এত তাচ্ছিল্য—এত অনাদর—এত অবজ্ঞা!"

মুন্না কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে কত যেন বেদনা লেখা—কত ভালবাসার ছবি! মুন্না তাঁহাকে হাতে ধরিয়া সস্নেহে টানিয়া তুলিল। কহিল,—"ধৈর্য্য ধর, অবশ্যই দিন ফিরিবে! কেন এত উতলা হইতেছ?"

অরুণ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে চিতোরের দিকে দেখাইলেন। কহিলেন, "দেখ, একটীও আলোক নাই—আজ চিতোর অন্ধকার! চিতোরের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। কবে আর আমাকে স্মরণ করিবে? ডাকিতে হইলে এতদিন ডাকিত! কোন্ আশায় আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিব?"

মুন্না শিহরিয়া উঠিল। সত্যই চিতোরের দৃশ্য আজ ভয়াবহ। একটী প্রদীপও তথায় আজ আশার আলোক

ফুটাইয়া তুলিতেছে না! মুন্না স্বামীকে লইয়া তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে চলিল।

* * * *

পর দিন মুন্না অরুণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এক অতি অসম সাহাসের কার্য্য করিল। মুন্না এক দল ভীল সৈন্ত লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চিতোরীদের সঙ্গে মিশিয়া গেল!

মুন্নার গায়ে অরুণসিংহের পরিচ্ছদ। রাজপুতেরা যুদ্ধাবসানে যখন দুর্গপ্রবেশ করিতে গেল, তখন মুন্নাকে তাহাদের মধ্যে দেখিয়া স্ত্রীলোক বলিয়া ধরিতে পারিল না। মুন্না নির্ব্বিবাদে দুর্গপ্রবেশ করিল। ভীলেরা রাত্রির অন্ধকারে পাঠানদিগকে অতিক্রম করিয়া আবার বনে ফিরিয়া আসিল।

গভীর রাত্রিতে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে, ভৈরবীর পদতলে পতিত হইয়া মুন্না এক অতি অদ্ভুত প্রার্থনা জানাইল!

ভৈরবী কহিলেন, "মুন্না, এ কি প্রার্থনা তোর! কেন তুই এ প্রার্থনা করিতেছিস্?"

মুন্না কহিল, "কিছুই তো তোমার অগোচর নাই মা। কেন ছলনা করিতেছ? আমার স্বামীর দুঃখ দূর কর।"

ভৈরবী কহিলেন, "সে যে তোর সর্ব্বনাশ! পরিণাম চিন্তা করিয়াছিস্ কি? ভাবিয়া দেখ।"

মুন্না কহিল, "ভাবিয়াছি। আমার কাছে, আমার সুখ চেয়ে আমার স্বামীর সুখ বড়! আমার সর্ব্বনাশ হইবে বলিয়া আমি পশ্চাৎপদ হইব না।"

ভৈরবী সন্তুষ্ট হইয়া তখন তাহার মস্তকে হস্ত বুলাইয়া দিলেন। সস্নেহে কহিলেন, "তবে উঠ্—ঐ ত্রিশূলটা দেখিতেছিস্? উহার মুখের দিকে চা।"

মুন্না সেইরূপ করিল।

তখন ভৈরবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছিস্?"

মুন্না কথা কহিতে পারিল না। তাঁহার চক্ষু রুদ্ধ হইয়া আসিল, মন শিথিল হইয়া পড়িল, ইচ্ছা-শক্তি লোপ পাইল।

ভৈরবী কহিলেন, "তবে এইবার ফের্।"

মুন্না ফিরিয়া দাঁড়াইল। ভৈরবী তখন ত্রিশূল তুলিয়া মন্দিরের ফটকের দিকে নির্দ্দেশ করিলেন। মুন্না নীরবে ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ চক্ষেই মন্দিরদ্বার অতিক্রম করিয়া গেল।

ভৈরবী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মুন্না বেশ 'হন্ হন্' করিয়া রাস্তার উপরে যাইয়া দাঁড়াইয়াছে! ভৈরবী তখন ত্রিশূলটা আরও উচু করিয়া ধরিয়া, এইবার মহারাণার

প্রাসাদের দিক্ লক্ষ্য করিলেন। তখন মুন্না সেই দিকে চলিল।

* * * *

গভীর রাত্রিতে সুসজ্জিত কক্ষে রত্নপালঙ্কে পড়িয়া মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ চিতোরের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, নিকটে একটা তৈল-প্রদীপ নিঃশব্দে জ্বলিতেছিল; চারিদিক্ সুপ্ত—কোথাও 'টু' শব্দটী নাই; অকস্মাৎ মহারাণার ভাবান্তর উপস্থিত হইল!

একি মানসিক বিকৃতি! মহারাণার বোধ হইল, যেন নীরব শূন্য কক্ষের বায়ুগুলি আজ আকৃতি ধরিয়া উঠিতেছে; একটা অপার্থিব বীণার ঝঙ্কার যেন বহুদূর হইতে ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছে; প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মিগুলি ম্লান করিবার জন্য যেন চারিদিকে অন্ধকার রাশি জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে!

মহারাণা উঠিয়া চক্ষু মর্দ্দন করিতে চাহিলেন, কিন্তু পারিলেন না। সমস্তটা শরীর যেন জড় ময়—দরজার সম্মুখের খোলা জায়গাটা যেন একটা বিশাল অন্ধকার পর্দ্দা! কিন্তু তাহার উপরে ওকি?

মহারাণা শিহরিয়া উঠিলেন। এ যে অসম্ভব উজ্জ্বল

দেবী-মূর্ত্তি! কোনওরূপে শিরোত্তোলন করিয়া সভয়ে কহিলেন, "কে তুমি? মানবী না দেবী! শীঘ্র বল,—এখানে তোমার কি প্রয়োজন?"

মূর্ত্তি ধীরে ধীরে কহিল,—"মঁয় ভুখা হুঁ!"

সেই স্বরে মহারাণার সমস্ত শরীর যেন হিম হইয়া আসিতে লাগিল। মহারাণা কহিলেন,—"ভুখা হুঁ! এত রাত্রিতে! মানুষী তুমি নও নিশ্চয়,—তাহা বুঝিতে পারিতেছি। নিশ্চয় তুমি চিতোরের রাজলক্ষ্মী! শোণিত-পিপাসায় কাতর হইয়া আসিয়াছ। বল, আর কত শোণিত চাই! প্রতিদিন অসংখ্য রাজপুত রক্ত উৎসর্গ করিতেছে, এখনও কি তোমার পিপাসা নিবৃত্তি হয় নাই?"

মূর্ত্তি কহিল, "মঁয় ভুখা হুঁ! সামান্য সৈনিকের রক্তে আমার কি হইবে? ভাল রক্ত চাই! দ্বাদশজন রাজ-কুমারকে চাই। ভুখা হুঁ—ভুখা হুঁ—রক্ত চাই, ভাল রক্ত চাই——"

কি ভয়ঙ্কর ক্ষুধা! লক্ষ্মণ সিংহের মনে হইল, তাঁহার ধমনীর ভিতরে রক্তবিন্দুগুলি অকস্মাৎ তুষার-বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে! দ্বাদশ জন রাজকুমার চাই! একবারে বংশ নির্ম্মূল! সত্যই কি এ চিতোরের রাজলক্ষ্মী!"

মূর্ত্তি আবার কহিল, "অবিশ্বাস করিস্ না, রক্ত দে, দ্বাদশ জন রাজকুমারকে দে, প্রতিদিন যুদ্ধে এক এক জনকে দে! চিতোর রক্ষা কর্—বংশ রক্ষা কর্—মঁয় ভুখা হুঁ, মঁয় ভুখা হুঁ!——"

মহারাণার বোধ হইল, বিশ্বসংসার যেন আজ ক্ষুধায় অস্থির হইয়া মুখব্যাদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! মহারাণা চীৎকার করিয়া উঠিলেন! কহিলেন—"মা, মা, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আর অস্থির হইও না! তোমার ওই দানবী ক্ষুধার বিভীষিকা আর প্রকটিত করিও না। আদেশ তোমার শিরোধার্য্য—লীলা সম্বরণ কর, চিতোরের উপর কৃপা-কটাক্ষ কর। চিতোরের জন্য সর্ব্বস্ব পণ!—চিতোর ছাড়িয়া যাইও না।"

মহারাণা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হস্তপদ অবশ হইয়া আসিল, দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইল,—অকস্মাৎ তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তখন মূর্ত্তিও ধীরে ধীরে কোথায় সরিয়া গেল।

(২)

পরদিন চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে মহারাণা সর্দ্দারদিগকে সমবেত করিয়া কহিলেন—"এই জাগ্রত মায়ের আদেশ

শিরোধার্য্য কর; অরুণসিংহকে খবর দাও—মায়ের ডাক আসিয়াছে। এইবার আর মানুষের শাসন নাই—কালই অরুণসিংহকে যুদ্ধে যাইতে হইবে—তারপর একে একে সব—”

বলিতে বলিতে মহারাণার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। মন্দিরের দ্বারে বসিয়া মহারাণী চিতোর-রাজমহিষী অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন—মহারাণা সেই দিকে চাহিয়া ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইলেন।

রাজ্ঞীর পার্শ্বে পদ্মিনীদেবী বসিয়া মায়ের পূজা করিতেছিলেন। অঞ্জলিবদ্ধহাতে মায়ের চরণপ্রান্ত দেখাইয়া তিনি তাঁহাকে ধমকাইয়া কহিলেন, “এই দিকে চা, দেখিতেছিস্ না, কি অপূর্ব্ব শান্তি! কি অপূর্ব্ব বিরাম! বাছারা যেখানে যাইবে, আমিরাও তো সেইখানে যাইব। তবে আবার এ ক্ষোভ কেন? আয়—কর্ত্তব্য কর্।”

একজন সর্দ্দার ধীরে ধীরে আসিয়া মহারাণাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, “রাণা, আমার মনে হয়, এ স্বপ্ন! কেন বৃথা উতলা হইয়াছেন? আমরা তো কখনও চিতোরেশ্বরীকে দেখি নাই। আমার মতে, ইহার পরীক্ষা করা উচিত। একটা অনির্দ্দিষ্ট ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এমন একটা গুরুতর—”

রাণা কহিলেন, "তুমি কি পরীক্ষা করিতে চাও?"

সর্দ্দার কহিলেন, "দেবীর যদি বাস্তবিকই এই অভিপ্রায় হইয়া থাকে যে, দ্বাদশ জন রাজকুমারকেই প্রাণ দিতে হইবে, তবে দেবী আসিয়া সে কথা আমাদের সকলের সম্মুখে বলুন। এক জনের নিকটে বলিলে, সত্য-মিথ্যা কিছু প্রতিপন্ন হয় না, আমরা সকলে দেবীর আদেশ শুনিব।"

মহারাণা কহিলেন, "এস তবে, দেবীর অর্চ্চনা করি। অবশ্যই তিনি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন; দেবীর আদেশ সত্য হইলে, অবশ্যই তিনি আবার আমাদিগকে দেখা দিবেন।"

তখন সমস্ত রাজপুত যাইয়া সেই মন্দিরের সম্মুখে জানু পাতিয়া মস্তক অবনত করিয়া বসিলেন; মন্দিরের ভৈরবী তাহাদের উপরে শান্তি জল নিক্ষেপ করিয়া দিলেন; সমস্বরে সকলে স্তুতি গান আরম্ভ করিলেন সেই মুহূর্ত্তে মন্দিরের প্রদীপটা একটু অনুজ্জ্বল হইয়া গেল।

রাজপুতেরা স্পষ্ট দেখিলেন, সেই অনুজ্জ্বল প্রদীপের পশ্চাতে মায়ের মূর্ত্তির কাছে তখন একটী অতি অপূর্ব্বা সুন্দরী দেবী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

মহারাণা চীৎকার করিয়া কহিলেন—"সেই মূর্ত্তি!"

রাজপুতেরাও চীৎকার করিয়া উঠিল, "জয় মাই কি জয়!—জয় চিতোরেশ্বরীর জয়!"

মূর্ত্তি তখন ধীরে ধীরে আবার প্রতিমার পশ্চাতে লুপ্ত হইয়া গেল! চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনা, বীরদর্প ও রণ-সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল।

(৩)

তারপর রাজপুত ও মুসলমানের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজপুতের আর মৃত্যুর ভয় নাই, মরিতেই তাহারা এখন যুদ্ধে যাইতে লাগিল; মরিতে মরিতেই তাহারা পাঠান সৈন্যকে মথিত করিয়া তুলিল।

ক্রমে রাজপুত্রগণ একে একে যুদ্ধে প্রাণ দিতে লাগিলেন। রাণার অনুমতি পাইয়া অরুণসিংহ চিতোরে ফিরিয়া আসিলেন!

প্রথম দিনই তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে হইল!

চিতোরের ফটক অতিক্রম করিয়া পাঠান-সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিবেন, এমন সময়ে অরুণসিংহ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পশ্চাতে অশ্বারোহণ করিয়া মুন্না! মুন্নার সেই পুরুষের সাজসজ্জা!—কেহ তাহাকে চিনিতে পারিতেছে

না। মুন্না অবিকল রাজপুত যোদ্ধার মত তরবারি সঞ্চালন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে। অরুণসিংহ ব্যস্ত হইলেন।

অরুণসিংহ মুন্নার ক্ষমতা জানিতেন, কিন্তু মুন্নার যে একটী সন্তান আছে—সেই চিন্তাই তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

অরুণসিংহ কহিলেন, "মুন্না, হামিরের কি হইবে? কেন তুমি আমার সঙ্গে আসিতেছ?"

মুন্না অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া উপরের দিকে দেখাইল। কহিল, "তিনি দেখিবেন! তাহাকে মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিয়াছি—যত্নের ত্রুটী হইবে না। আমার স্থান তোমারই পার্শ্বে!"

অরুণসিংহ আর শব্দ করিলেন না। তখন উভয়েই দ্রুত গতিতে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। অনন্তবিস্তৃত পাঠান-সমুদ্রে ক্ষুদ্র একটী সরিৎস্রোতের মত কোথায় অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পরদিন রাণার আর একটী পুত্র সেনাপতি হইয়া যুদ্ধে গেলেন। তিনিও এইরূপে প্রাণবিসর্জ্জন দিলেন। তার পরদিন আরও একটী গেলেন!—তার পরদিন আরও

একটী! ক্রমে এগার দিনে এগারটী পুত্র যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন, শুধু অজয়সিংহকে মহারাণা প্রাণ ধরিয়া বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না। দ্বাদশদিনে অজয়সিংহের ডাক পড়িল।

অজয়সিংহ লক্ষ্মণসিংহের দ্বিতীয় পুত্র, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়-সন্তান!

মহারাণা তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "অজয়, তুমি বংশের শেষ-রত্ন! কি করিয়া আমি তোমায় এ কাল সমরে পাঠাইব? তুমি আজই তোমার সন্তান দু'টীকে লইয়া কৈলবার দুর্গে গমন কর; তোমার প্রাণের বিনিময়ে আজ রাণা ভীমসিংহ ও আমি উভয়েই প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছি। অবশ্যই দেবী তুষ্ট হইবেন।"

অজয় ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন, "রাণা, সকলেই দেশের জন্য প্রাণ দিলেন, আমার নিকট হইতে কেন এ সৌভাগ্য কাড়িয়া লইতেছেন? আমাকেও—"

রাণা বাধা দিয়া কহিলেন, "এ অন্তিম সময়ে পিতৃবাক্য অবহেলা করিও না, অজয়! আমার শেষ আদেশ পালন কর, তোমার কল্যাণ হৌক, বংশ রক্ষা হৌক্।"

অজয়সিংহ নীরবে সেই দিনই পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য

করিয়া চিতোর পরিত্যাগ করিলেন। চিতোর-রাজমহিষীর শেষ বক্ষের-ধনটীও অদৃশ্য হইয়া গেল। রাণী ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিলেন।

রাজ্ঞী পদ্মিনী আসিয়া তাঁহাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া কহিলেন, "দু'দিনের অদর্শনের জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছ মা, চিরমিলনের দিন যে নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে! এখন সেই কথা মনে করিয়া প্রফুল্ল হও। মায়ের অর্চ্চনা কর। রাণী তুমি, রাণীর মত এখন তোমাকে সকলকে সান্ত্বনা দিতে হইবে। এখন কি তোমায় এ ব্যাকুলতা সাজে?"

রাণীকে লইয়া পদ্মিনী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তখন সেখানে অসংখ্য রাজপুত-রমণী একত্রিত হইয়া মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। মায়ের পরিচারিকা ভৈরবী তাঁহাদিগকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক ভিতরে লইয়া গেলেন।

পদ্মিনী ভৈরবীকে বলিলেন, "মা আমরা মন স্থির করিয়াছি। জহর ভিন্ন আর তো উপায় নাই!—এখন সে অনুষ্ঠান কর। কালই আমরা মায়ের চরণে জীবন উৎসর্গ করিব।"

ভৈরবী কহিলেন "সেই উত্তম। এস মা, আমিও মায়ের অভিপ্রায় জানিয়াছি। কালই সে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আর সময় নাই!"

(৩)

পদ্মিনী জহর ব্রত করিবেন—কথাটা সেই রাত্রিতেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল—চিতোরের গৃহে গৃহে হুলস্থূল পড়িয়া গেল!

জহর রাজপুতদিগের অন্তিম-ব্রত। শত্রুর হস্তে পড়িয়া যখন তাঁহারা মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম—সব হারাইতে বসে, নিরুপায়ের বিভীষিকা যখন তাঁহাদিগকে অস্থির করিয়া তোলে, তখনই তাঁহারা এ মহাযজ্ঞের আশ্রয় ল'য়—তখন দলে দলে রাজপুত, দলে দলে রাজপুতনী হাসিতে হাসিতে মৃত্যুর ক্রোড়ে লাফাইয়া পড়ে। পুরুষেরা মুক্ত তরবারি-হস্তে শত্রু-সমুদ্রে ঝাঁপ দেন, রমণীরা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে দলে দলে হাসিতে হাসিতে প্রাণত্যাগ করে! চিতোরের ভাগ্যেও আজ সেই মহাদিন উপস্থিত। চিতোরীরা আজ সেই মহদনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

আকাশে সে রাত্রিতে একটুকুও মেঘ নাই। চারি-

দিক্ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে, ঝরা শেফালী ফুলের মত কতকগুলি উজ্জ্বল নক্ষত্র স্থির শান্ত দৃষ্টিতে চিতোরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, বসন্তের নির্ম্মল বায়ু কি এক সঙ্গীত লইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

চিতোরীদের প্রাণেও সেদিন প্রকৃতির সে প্রীতির হিল্লোল আসিয়া স্পর্শ করিল! প্রভাতে নবারুণের রক্তিম কিরণের সঙ্গে তাঁহাদিগেরও নবজীবন নবরাগে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিবে; মৃত্যুর ক্রোড়ে সমস্ত দুঃখ, সমস্ত পরিশ্রম-ভার ন্যস্ত করিয়া তাহারাও কাল এক দিব্যধামে চলিয়া যাইবেন—তাঁহাদের শ্রান্তিম্লান হৃদয়গুলিও আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সারারাত্রি তাঁহারা একটুকুও ঘুমাইতে পারিলেন না। সে দিন নিদ্রার অবসর নাই। প্রভাতেই জীবনের হিসাব নিকাশ পরিস্কার করিতে হইবে! তাঁহারা দলে দলে সে রাত্রি চিতোরের গৃহে গৃহে, রাজপথে রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পরে পদ্মিনী চিতোর-বাসিনীদিগকে সঙ্গে করিয়া নগরী পরিভ্রমণে বাহির হইলেন। আজ তাঁহাদের সকল সঙ্কোচ দূর হইয়াছে! চিতোরের রাজ-মহিষীও আজ অবাধে চিতোরের পথে পথে, ঘাটে ঘাটে পদব্রজে ঘুরিয়া

বেড়াইতেছেন! তাঁহাদের অগ্রপশ্চাতে চারণীগণ আজ গৌরব-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এক অমৃতমদিরা ছড়াইতেছে।

চিতোরের প্রত্যেক রাস্তা, প্রত্যেক পল্লীর নিকট আজ তাঁহারা নীরবে বিদায় ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কত প্রিয়কাহিনী, মধুময় স্মৃতি তাঁহাদের, সেই সকলের সহিত জড়িত! আজ বিদায়ের মুহূর্ত্তে সেই সব স্মৃতি যেন একত্রে জাগ্রত হইয়া তাঁহাদিগকে একান্ত নিষ্ঠুর ভাবে আক্রমণ করিতে আসিল। নীরবে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

পদ্মিনী দেখিলেন,—ওই সেই গোমুখী, যাহার নিকটে বসিয়া ভীমসিংহের নিকটে তিনি নিদাঘের তপ্ত-দিবাবসানে কত গল্প শ্রবণ করিয়াছেন, কত সুমধুর পাখীর ডাক শুনিয়াছেন; ওই সেই কীর্ত্তিস্তম্ভ, যাহার চূড়ায় এমনি কত জ্যোৎস্না-পুলকিতা নিশিতে প্রিয়তমের বাহু-অবলম্বিনী হইয়া তিনি সুপ্ত-জগৎ দর্শন করিয়াছেন; ওই সেই দেউল, যাহার সোপান-তলে কতকাল মুক্ত করপুটে দেবতার নিকট তিনি কত আরাধনা করিয়াছেন!—সকলই সেই! আজও তাহারা তেমনি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—তেমনি

অটল! কিন্তু কাল তাহাদের অবস্থা কি হইবে, কে জানে?

নগরী পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া রমণীগণ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পদ্মিনীও নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া একবার চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিলেন। কত অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব সামগ্রী, অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বিলাসোপকরণ, তাঁহার সেই মনোরম কক্ষটীতে সজ্জিত! পদ্মিনী ভাবিলেন, এই সকল কি শেষকালে পাঠান সেনার পদতলে লুণ্ঠিত হইবে? পদ্মিনী স্তূপাকৃতি করিয়া সে গুলিতে স্বহস্তে অগ্নি ধরাইয়া দিলেন!—যে গুলি পুড়িতে পারিলেন না, সে গুলি বাতায়ন পথে সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। নিমেষের মধ্যে আসবাব-পত্র বস্ত্র-অলঙ্কার সব নিঃশেষিত হইয়া গেল। পদ্মিনী তখন স্থির হইয়া বসিয়া ভীমসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একটা কাকাতুয়া ঘরের কোণে খাচায় বসিয়াছিল, অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। পদ্মিনীর মনে হইল, গৃহপালিত পশুপক্ষীগুলিকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। পদ্মিনী উঠিয়া কাকাতুয়াটাকে মুক্ত করিয়া দিলেন; বারান্দায় একটা হরিণ ছিল, তাহার গলার শিকলটা খুলিয়া

লইলেন, একটা পিঁজরায় ময়না ছিল, তাহাকেও স্বাধীনতা দিলেন। পশুপক্ষীগুলি মুক্ত হইয়াও বার বার তাঁহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক বিন্দু অশ্রু তাহাদের জন্যও পদ্মিনী ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

গভীর রাত্রিতে ভীমসিংহ জহরের সকল আয়োজন প্রস্তুত করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে স্বামী স্ত্রীতে জন্মের মত শেষ দেখা হইল! অনেকক্ষণ কেহই কথা কহিতে পারিলেন না। পদ্মিনী শেষটা ভক্তি-গদ্‌গদ-চিত্তে গললগ্নীকৃতবাস হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভীমসিংহ বাহুতে তুলিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

নবদম্পতীর মত পরস্পরের মুখোমুখী হইয়া এরূপে তাঁহারা কতদিন বসেন নাই! আজ এই ইহলোক পর-লোকের সন্ধিস্থলে আবার যেন যৌবনের সেই আবেগ ফিরিয়া আসিল! উভয়ে উভয়ের দেহের উপরে দেহ ন্যস্ত করিয়া পরস্পরের প্রতি নীরবে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। একটী কথাও তাঁহাদের আবেগরুদ্ধ হৃদয় হইতে বাহির হইয়া বাহিরে ফুটিয়া উঠিতে পারিল না। সারা রাত্রি এমনি ভাবে কাটিয়া গেল।

প্রত্যূষের ম্লান ছায়া ভালরূপ পরিস্ফুট হইতে না হইতেই পরদিন চিতোরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। দলে দলে ব্রাহ্মণ, দলে দলে পুরোহিত, দলে দলে পুরনারীগণ মঙ্গল-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে জহরের পবিত্র কুণ্ডাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। আলুলায়িত-কুন্তলা, রক্তবসনা রমণীগণের উজ্জ্বল প্রভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!

পর্ব্বতের একটী সুবিশাল অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে সুবিস্তৃত চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত চিতাশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। পুরোহিতগণ মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘড়ায় ঘড়ায় উহাতে ঘি ঢালিয়া দিলেন। দাউ দাউ করিয়া চিতা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই গহ্বরের একটী মাত্র মুখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অসংখ্য রাজপুত, অসংখ্য রাজপুতনী জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ঘন ঘন হুলুধ্বনি মন্ত্রপাঠ ও আনন্দ-শব্দে মুহূর্ত্তের জন্য সকল নিরানন্দ, সকল উদ্বেগ দূর হইয়া গেল! পদ্মিনী-রাণী একদিকে ভৈরবীকে ও একদিকে রাজমহিষীকে লইয়া কুণ্ডের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন। সেই মুহূর্ত্তে চারিদিক্ হইতে চারণীগণ পুষ্পবৃষ্টি করিল। পুরোহিত তখন উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন! প্রথমে রাজপুত যোদ্ধৃগণ সে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, অস্ত্র

কোষমুক্ত করিয়া, দুর্গদ্বারের অভিমুখে ছুটিয়া গেলেন। পরে রমণীগণ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই সহস্র রমণীকণ্ঠের সমবেত ধ্বনি গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া—যেখানে দুর্গদ্বারে শত শত রাজপুত পাঠান সেনার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন—সেই খানে যাইয়া পৌছিল। রাজপুতেরা আকাশের দিকে উদ্‌গ্রীব-নয়নে ঘন ঘন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

তারপর এক মুহূর্ত্ত মাত্র! সেই এক মুহূর্ত্ত পরে অতি গভীর ধূমপুঞ্জ আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রাজপুতেরাও দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ, ভীমসিংহ ও বাদল সেই কয়েক সহস্র মাত্র রাজপুত সৈন্য লইয়া পাঠান বাদশাহের অনন্ত সৈন্য-সমুদ্রের মধ্যে কয়েকটী জল বুদ্বুদের মত মিশিয়া গেলেন।

(৪)

যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। দীর্ঘ এক বৎসরের কঠিন সাধনার পরে আলাউদ্দীন বিজয়-গর্ব্বে চিতোর প্রবেশ করিলেন।

চিতোরের সেই দুরারোহ দুর্গপথ অতিক্রম করিতে করিতে আলাউদ্দীন কত কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন! কত আশার ছবি, সুখস্বপ্ন তাঁহাকে প্রমোদিত করিয়া তুলিল!

দুর্গদ্বারে পৌঁছিয়া আলাউদ্দীন প্রথমেই পদ্মিনী-আবাসের দিকে চলিলেন। সারাটা রাস্তা শূন্য! কোন গৃহে কোনখানে একটি মনুষ্য নাই! পথ, ঘাট ও সৌধতলগুলি কুঙ্কুম, চন্দন ও ছিন্নপুষ্পহারে রঞ্জিত হইয়াছে। তাহাদের দুই পার্শ্বে উজ্জ্বল অট্টালিকাগুলি আলাউদ্দীনকে যেন নীরব হাস্যে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। আলাউদ্দীন চমকিয়া উঠিলেন!

পদ্মিনী-আবাসের নিকটে আসিয়া আলাউদ্দীনের প্রাণটা নিতান্তই কেমন করিয়া উঠিল। সেই, সে-দিনকার উজ্জ্বল পুরী আজ একি নিরানন্দ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে? আলাউদ্দীন দেখিলেন, তাহার গবাক্ষদ্বারাদি মুক্ত, প্রবেশপথে একটিও রক্ষী নাই, এতটুকু—এতটুকু জীবনের লক্ষণ কোনখানে দেখা যাইতেছে না!

সকলকে সাবধানে চারিপার্শ্ব রক্ষা করিতে বলিয়া আলাউদ্দীন একাকী পুরী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তপদ কাঁপিতে লাগিল, হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল,

একটা কি অজ্ঞাত আশঙ্কায় মন বিচলিত হইল; কৈ কোথাও তো কেহ নাই!

আলাউদ্দীন ডাকিলেন—"পদ্মিনী!"

কোথায় পদ্মিনী! বিকট একটা প্রতিধ্বনি হি হি করিয়া বিদ্রূপ করিয়া উঠিল; সে শব্দ কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আলাউদ্দীনের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহিল, সেই উন্মুক্ত মেজেতেই দিল্লীর বাদসাহ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন!

হঠাৎ আলাউদ্দীন উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন—ওই না পদ্মিনী! বাদশাহ স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, কে যেন একজন চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"ওগো, এসো এসো—ঘরে এসো—বাহিরে দাঁড়াইয়া কেন? ঘরে এসে বসো!"

বাদশাহ দ্রুত সেই দিকে গেলেন! কৈ কোথাও তো কেহ নাই। বাদশাহ দেখিলেন, একটা ময়না উড়িয়া উড়িয়া সেই কক্ষে এই ধ্বনি করিতেছে! বাদশাহ যাইতেই সেটা আবার বলিয়া উঠিল, "বসো বসো,—আসনে বসো—ঐ যে আসন!"

এও বিদ্রূপ! বাদশাহ ভাবিলেন, সমস্তটা জগৎ আজ অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার ষড়যন্ত্র করি-

য়াছে! বাদশাহ ক্রোধে অন্ধ হইয়া সেই নিরীহ পাখীটাকে অস্ত্রে বিদ্ধ করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিলেন। পাখীটা একটুও আপত্তি না করিয়া, একটুখানি মাত্র ছটফট করিয়া সেইখানে মরিয়া গেল!

তারপর আলাউদ্দীন নীরবে তন্ন তন্ন করিয়া সেই পুরীর প্রত্যেক ঘর অনুসন্ধান করিলেন! কোথাও কেহ নাই—সব শূন্য!

ক্ষিপ্ত বাদশাহ বাহিরে আসিয়া অনুমতি দিলেন—দুর্গের প্রত্যেক কোণ অনুসন্ধান কর, যেখানে যাহাকে পাও ধরিয়া আন—কাহাকেও ছাড়িয়া দিও না।

চারিদিকে পাঠানসৈন্য ছুটিয়া গেল। দুর্গের যেখানে যাহা ছিল, তাহাদের হাতে বিনষ্ট হইল। উদ্যান, গৃহ, অট্টালিকা, দেবমন্দির—সব চূরমার হইয়া যাইতে লাগিল। শত শত বৎসরের কীর্ত্তি—সব ধ্বংস পাইল। কিন্তু জন-প্রাণী কোথাও মিলিল না; একটি মনুষ্যও কোথাও জীবিত পাওয়া গেল না!

তখন আলাউদ্দীন স্বয়ং পদ্মিনীকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। প্রত্যেক কক্ষ, বারান্দা, গৃহকোণ, উদ্যান, কানন, মন্দির, মঠ, পর্ব্বতরন্ধ্র খুঁজিয়া দেখিলেন, কোথাও

কেহ নাই! তখন নিরাশ-হৃদয়ে একটা সরোবরের পাষাণ-নির্ম্মিত সোপানে বসিয়া পড়িলেন!

পর্ব্বতগাত্র হইতে একটা স্বচ্ছ বারিধারা গোমুখাকৃতি একখণ্ড পাষাণের ভিতর দিয়া সরোবরে গড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহার চূর্ণকণা আসিয়া বাদশাহকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। বাদশাহ আবার উঠিয়া পদ্মিনী-মহলের দিকে চলিলেন। এমন সময় পার্শ্বের পর্ব্বতগাত্রে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। বাদশাহ থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

একটা সাদা ধূমরেখা একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের ফাঁক দিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে! একটা মৃদু সুবাস তাহার উপর দিয়া আসিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে! বাদশাহ কহিলেন, "ওকি?"

অনুমতি পাইয়া শত শত পাঠান শত শত হস্তে ঠেলিয়া সেই বহুদূর বিস্তৃত পাথরখানা ফেলিয়া দিল। তখন একটা নিতান্ত ভয়াবহ দৃশ্য তাহাদিগকে সচকিত করিয়া তুলিল!

আলাউদ্দীন দেখিলেন,—রাশি রাশি ধূম, রাশি রাশি লেলিহান অগ্নিশিখার মুখ হইতে বাহির হইয়া একটা বিরাট্ পর্ব্বত-কন্দরের মুখ একবারেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; তাহার ভিতর হইতে অগুরু, চন্দন ও ধূপ-ধূনাদির অপূর্ব্ব

সুবাস চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে ; গহ্বর-দ্বারে অসংখ্য কুসুমহার, কুঙ্কুমের রেখা ও চন্দনবিন্দু বিস্তৃত রহিয়াছে।

একটা জ্বলন্ত লৌহদণ্ড কে যেন অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়মধ্যে বিদ্ধ করিয়া দিল! আলাউদ্দীন এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।—তার পরই অব্যক্ত একটা যাতনাধ্বনি করিয়া ক্ষিপ্তের মত অগ্নিকুণ্ডের দিকে ছুটিয়া গেলেন।

একজন পাঠান সর্দ্দার নিকটে ছিল, সে তাঁহাকে ধরিয়া ফিরাইল।

বাদশাহ কহিলেন, "কি দেখিতেছ সর্দ্দার? অগ্নি নির্ব্বাপিত কর, লাখো রূপেয়া পুরস্কার!—পদ্মিনীকে রক্ষা কর।"

কিন্তু হায়, পদ্মিনী তখন কোথায়? আলাউদ্দীনের লক্ষমুদ্রা—লক্ষ সৈন্যও তখন সতীর একগাছি কেশ স্পর্শ করিতে পারে না! পাঠান সর্দ্দারেরা সে কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। বাদশাহ তখন দীন দরিদ্র পথের ভিখারীর মত বক্ষে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন!

এতদিনের সাধনা, এতদিনের সুখ-স্বপ্ন সব বিফল হইয়া গেল; একটা ক্ষুদ্রা, অবলা নারী দিল্লীর সিংহাসনকেও পদাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া অবাধে প্রস্থান করিল!

আলাউদ্দীন অনেকক্ষণ বিমনা হইয়া রহিলেন, তারপর আবার ধীরে ধীরে পদ্মিনী-প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

সেই জনশূন্য নিস্তব্ধ কক্ষে আসিলে আলাউদ্দীনের রুদ্ধ কপাট মুক্ত হইয়া গেল। তাঁহার চির-অভিমানগর্ব্বিত হৃদয়খানি একটা সামান্যা নারীর ঢল ঢল মুখখানি স্মরণ করিয়া আজ ফুকারিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল! দিল্লীর বাদশা সেই ধূলিবিলুণ্ঠিত উন্মুক্ত মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িলেন।

অনেক কষ্টে বাদশাহ রাণীর দু'চারিখানি সামান্য স্মৃতি-চিহ্ন খুঁজিয়া বাহির করিলেন। সেই স্মৃতিচিহ্ন গুলি লইয়া তিন দিন তিনি পদ্মিনী-প্রাসাদে বসিয়া কাটাইলেন।

এই তিনদিনে পাঠানেরা চিতোরকে শ্মশানে পরিণত করিল। যেখানে যাহা কিছু ধনরত্ন ছিল সকলই লুণ্ঠন করিয়া লইল। চতুর্থ দিনে তাহারা আসিয়া পদ্মিনী-প্রাসাদও লুণ্ঠন করিতে চাহিল। বাদশাহ তাহাদিগকে ধমকাইয়া ফিরাইলেন।

বাদশাহ কহিলেন, "সাবধান! এ গৃহে হস্তার্পণ করিও না। এ অতি পবিত্র স্থান—ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

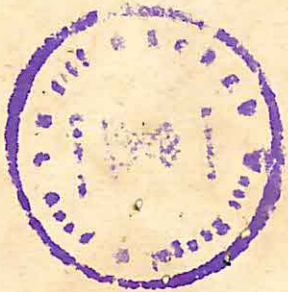

পাঠানেরা নিরস্ত্র হইয়া তাঁহার মুখপ্রতি চাহিল। বিস্মিত হইয়া দেখিল,—কি পরিবর্ত্তন!